

অন্ত্য-লীলা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃপাণ্ডগৈৰ্ঘঃ স্নগৃহাকৃপা-
উদ্ধৃতা ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্ ।
হস্ত স্বরূপে বিদধেহস্তরঙ্গং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমুং প্রপদে ॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-সঙ্গে ।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানারঙ্গে ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

স্নগৃহাকৃপাং শোভনাং গৃহাকৃপাং । ভঙ্গ্যা যে কৃপারূপগুণা শৈবঃ । ভঙ্গ্যা ইতি রাত্রিশেষে শ্রীযত্নন্দনাচার্য্য-
বাস্তবপ্রেরণয়া তদগৃহং বাপয়িত্বাচার্য্যেণসহ তদগৃহগমনায় কিঞ্চিং প্রদেশং শ্রীরঘুনাথদাসং নীত্বা তস্মাৎ তত্ত পলায়নং
ইত্যেবংরূপয়া ভঙ্গ্যা । চক্রবর্তী । ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

অন্ত্যলীলার এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্লো । ১ । অর্থঃ । যঃ (যিনি) কৃপাণ্ডগৈঃ (কৃপারূপ রজ্জুদ্বারা) স্নগৃহাকৃপাং (স্নশোভন গৃহরূপ অন্ধকূপ
হইতে) রঘুনাথদাসং (শ্রীরঘুনাথদাসকে) ভঙ্গ্যা (ভঙ্গীপূর্বক—চাতুরীপূর্বক) উদ্ধৃতা (উদ্ধার করিয়া) স্বরূপে
(স্বরূপ-দামোদরের হস্তে) হস্ত (অর্পণ করিয়া) অন্তরঙ্গং (স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত) বিদধে (করিয়াছিলেন), অমুং
(সেই) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) প্রপদে (আশ্রয় করি) ।

অনুবাদ । যিনি কৃপারূপ রজ্জুদ্বারা স্নশোভন-গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে শ্রীরঘুনাথদাসকে চাতুরীপূর্বক উদ্ধার
করিয়া স্বরূপ-দামোদরের হস্তে অর্পণ করতঃ স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আমি শরণাগত
হইলাম । ১

কৃপাণ্ডগৈঃ—কৃপারূপ গুণ (রজ্জু)-দ্বারা ; স্নগৃহাকৃপাং—স্ন (উত্তম, স্নশোভন) গৃহরূপ অন্ধকূপ
(অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপ) হইতে শ্রীল রঘুনাথদাসকে উদ্ধৃতা—উদ্ধার করিয়া ; অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর কূপ হইতে যেমন রজ্জু-
দ্বারা কোনও জিনিসকে তুলিয়া আনা হয়, তদ্রূপ সংসার-রূপ অন্ধকূপ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাদ্বারা রঘুনাথদাসকে উদ্ধার
করিয়াছিলেন । “স্নগৃহ” বলার হেতু এই যে, রঘুনাথ-দাসের পিতা-জ্যেষ্ঠা ছিলেন সপ্তগ্রামের রাজা—বিশেষ সম্পন্ন
ব্যক্তি । রঘুনাথ ছিলেন তাঁহাদের বিপুলসম্পত্তির একাত্ত ভাবী অধিকারী । সুরমা অটালিকাদিতে তাঁহার বাসস্থান ছিল ;
তাই তাঁহার গৃহকে স্নগৃহ বলা হইয়াছে । ইহাকে অন্ধকূপ বলার হেতু এই যে, অন্ধকারময় কূপে পতিত হইলে লোক
যেমন নিজের চেষ্টায় উঠিতে পারে না, সেখানে থাকিয়া কেবল মশা, মাছি, জোক, পোকাদির দংশন-যন্ত্রণাই ভোগ
করে, একটু আলোকের রশ্মিও দেখিতে পায় না, তদ্রূপ বিষয়-সম্পত্তির ও মায়িক ভোগ্যবস্তুর মোহে পড়িয়াও লোক

যতপি অন্তরে কৃষ্ণবিরোগ বাধয়ে ।

বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখ-ভয়ে ॥ ৩

উৎকট বিরোগদুঃখ যবে বাহিরায় ।

তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥ ৪

রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান ।

বিরহবেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কেবল ইচ্ছিয়-তৃপ্তির বাসনারূপ অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে; কখনও ভগবদুন্মুখতার ক্ষীণ রশ্মিও দেখিতে পায় না, সংসার-কূপে পড়িয়া কেবল কাম-ক্রোধাদির এবং ত্রিতাপ-জ্বালাদির যন্ত্রণাই সহ করিয়া থাকে, কোনও মহাপুরুষের কৃপা বা ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত জীব নিজের চেষ্টায় কখনও এই সংসারকূপ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। “মহৎ-কৃপা বিনা কোন কৰ্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ সংসার নহে ক্ষয় ॥ ২।২২।৩২ ॥” এতাদৃশ সংসার-কূপ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিলেন। কিরূপে উদ্ধার করিলেন? **ভঙ্গ্য**—ভঙ্গীপূর্বক, চাতুরীপূর্বক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চাতুরীটী এই :—এই পরিচ্ছেদে রঘুনাথদাস গোস্বামীর বিবরণ বর্ণিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে পলাইয়া যাইবার ভয়ে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠা সর্কদাই রঘুনাথের সঙ্গে গ্রহরী রাখিতেন। এক রাত্রিতে গ্রহরীবেষ্টিত রঘুনাথ বাহিরে দুর্গামণ্ডপে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় শেষরাত্রিতে তাঁহার গুরুদেব শ্রীযত্ননন্দন আচার্য আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বাহিরে আনিলেন এবং নিজের ঠাকুর-সেবার পাচক-ব্রাহ্মণ পলাইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাকে সাধিয়া আনিবার নিমিত্ত রঘুনাথকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। কতদূর যাওয়ার পরে রঘুনাথ একাকীই পাচকের নিকটে যাইতে পারিবে বলিয়া আচার্যকে ফিরিয়া যাইতে অমুরোধ করিলেন; আচার্যের আজ্ঞা লইয়া রঘুনাথ অগ্রসর হইলেন, আচার্যও বাড়ী চলিয়া গেলেন। রঘুনাথ আর গৃহে ফিরেন নাই, পলাইয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। এই বাপারে প্রভুর চাতুরী এই যে, তিনিই অন্তঃকরণে প্রেরণাবারা যত্ননন্দন আচার্যকে রাত্রিশেষে রঘুনাথের নিকটে পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে ঘরের বাহির করিয়া কিয়দূর একসঙ্গে যাইয়া রঘুনাথের কথামত বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়ার নিমিত্ত আচার্যের প্ররুতি জন্মাইলেন। এই সুযোগ পাইয়াই রঘুনাথ গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। যাহাউক, এইরূপ চাতুরীপূর্বক রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিয়া প্রভু তাঁহাকে স্বরূপে—স্বরূপ-দামোদরে, স্বরূপ-দামোদরগোস্বামীর হস্তে অর্পণ করিলেন এবং এইরূপে স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গ ও উপদেশের প্রভাবে রঘুনাথকে তিনি স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত করিয়া লইলেন। এমন কৃপালু যে শ্রীমন্মহাপ্রভু, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন—তাঁহার কৃপায় যেন প্রারন্ধ-কার্যে তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন, ইহাই যেন তাঁহার অন্তর্নিহিত বাসনা। এই শ্লোকে গ্রন্থকার ভঙ্গীক্রমে এই পরিচ্ছেদে বর্ণনীয় বিষয়েরও ইঙ্গিত দিলেন।

৩। **যতপি**—যদিও। **অন্তরে**—অন্তঃকরণে। **কৃষ্ণবিরোগ**—শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত দুঃখ। **বাধয়ে**—বাধা দেয়; কষ্ট দেয়। **ভক্ত-দুঃখভয়ে**—প্রভুর অন্তরের দুঃখের কথা শুনিলে ভক্তদেরও অত্যন্ত দুঃখ হইবে, এই আশঙ্কায় প্রভু নিজের দুঃখের কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই।

৪। **উৎকট**—অসহ, অসম্বরণীয়; যাহা কিছুতেই সামলাইয়া রাখা যায় না। **উৎকট বিরোগ-দুঃখ** ইত্যাদি—প্রভুর অন্তঃকরণে কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখ যখন এত অসহ হইয়া উঠে যে, তাহা আর কিছুতেই সামলাইয়া রাখিতে পারেন না, তখন তাহা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িত। এইরূপে অন্তরের অসহ দুঃখ যখন বাহির হইয়া পড়িত, তাঁহার তখনকার কাতরতা অবর্ণনীয়, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। **বৈকল্য**—বিকলতা, কাতরতা।

৫। **রামানন্দের কৃষ্ণকথা** ইত্যাদি—কৃষ্ণবিরহ-বেদনায় প্রভু যখন অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িতেন, তখন রামানন্দরায় প্রভুর চিত্তের ভাবানুকূল কৃষ্ণকথা শুনাইতেন এবং স্বরূপদামোদরও তখন ভাবানুকূল গান গাহিতেন। তাহাতেই প্রভুর চিত্তে শান্তি জন্মিত।

দিনে প্রভু নানাসঙ্গে হয় অগমন।

রাত্রিকালে বাঢ়ে প্রভুর বিরহবেদনা ॥ ৬

তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুইজনা ।

কৃষ্ণরসশ্লোক-গীতে করেন সাস্তনা ॥ ৭

সুবল যৈছে পূর্বের কৃষ্ণসুখের সহায় ।

গৌরসুখদানহেতু তৈছে রামরায় ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৬। দিনে প্রভু ইত্যাদি—দিবাভাগে নানাবিধ লোক প্রভুর দর্শনে আসিত; তাহাদের সঙ্গে নানাবিধ কথায় ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া প্রভু একটু অগমনক্ষ থাকিতেন, শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দুঃখ তখন তাঁহাকে তত অধীর করিতে পারিত না। রাত্রিকালে ইত্যাদি—কিন্তু রাত্রিকালে প্রভু একাকী থাকিতেন বলিয়া একমাত্র কৃষ্ণবিরহ-দুঃখেই তাঁহার সমস্ত চিত্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকিত, তাই ঐ সময়ে তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণাও খুব বেশী হইত।

৭। তাঁর সুখ হেতু—প্রভুর সুখের নিমিত্ত; কৃষ্ণকথা ও গান শুনাইয়া প্রভুর বিরহ-যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিবার নিমিত্ত।

রহে—রাত্রিতে প্রভুর নিকটে থাকেন।

দুইজনা—স্বরূপদামোদর ও রায়-রামানন্দ।

কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে—কৃষ্ণকথা-রসময়-শ্লোক ও গীত। স্বরূপদামোদর গীত গাহিতেন, আর রামানন্দ কৃষ্ণকথা শুনাইতেন।

৮। স্বরূপদামোদর ও রায়-রামানন্দ, এই দুইজনের কে কি ভাবে কৃষ্ণবিরহ-কাতর শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাস্তনা দিতেন, তাহা “সুবল যৈছে” হইতে “মহাপ্রভুর প্রাণ” পর্য্যন্ত দুই পয়ারে বলিতেছেন।

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন ঘটাইয়া দিয়া সুবল যেক্রমে রাধা-বিরহ-কাতর শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান করিতেন, রামানন্দরায়ও সেই ভাবে শ্রীশ্রীগৌরের সুখ-বিধান করিতেন।

যৈছে—যেভাবে, যেক্রমে। পূর্বে—পূর্ব-লীলায়, ব্রজলীলায়। তৈছে—তদ্রূপ, সেইভাবে।

এই পয়ারে দুইটী বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন। প্রথমতঃ, রায়রামানন্দকে সুবলের ভাবাপন্ন বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে, রামানন্দরায়ে ব্রজের প্রিয়নামসখা অর্জুন, পাণ্ডুপুত্র অর্জুন, ললিতা ও অর্জুনায়া নামী গোপী মিলিত হইয়া আছেন। রামানন্দ যে ব্রজলীলায় সুবল ছিলেন, গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায় তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। গণোদ্দেশ-দীপিকার মতে গৌরীদাস-পণ্ডিতই ব্রজলীলায় সুবল ছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বাক্যও কিছুতেই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না; তাহাতে আমাদের মনে হয়, রামানন্দরায়ে অর্জুনাদি যেমন মিলিত হইয়াছেন, সুবলও তদ্রূপ মিলিত হইয়াছেন; গৌরীদাস-পণ্ডিত সুবল হইলেও রামানন্দেও সুবলের ভাব কিছু আছে। ব্রজলীলার অনেকের ভাব গৌরলীলায় একজনেতে, ব্রজলীলার একজনের ভাবও গৌরলীলায় বহুজনে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আবার শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামিপাদের মতে, ব্রজের বিশাখা-সখীই “রায়রামানন্দতয়া বিখ্যাতোহভূৎ কলৌ যুগে—কলিতে রায়রামানন্দরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন।” আজকাল যে সকল মহাহুভব বৈষ্ণব মধুর-ভাবের উপাসক, তাঁহাদের অনেকেই বোধ হয় এই মতাবলম্বী।

দ্বিতীয়তঃ, এই পয়ারে রামানন্দরায়ে যেমন সুবলের ভাবাপন্ন বলা হইয়াছে, তেমনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকেও শ্রীকৃষ্ণভাবাপন্ন বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু নীলাচলে গম্ভীরা-লীলার যে সকল উক্তি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের কোনওটীতেই শ্রীশ্রীগৌরের শ্রীকৃষ্ণভাব প্রকটিত আছে বলিয়া মনে হয় না। আবার শ্রীরাধার ভাবে প্রলাপোক্তির সময়েও স্বরূপদামোদরের সঙ্গে রায়রামানন্দকেও প্রভুর সাস্তনা দান করিতে দেখা যায়।

এই সকল বিষয়ের সমাধান বোধ হয় এইরূপ :—শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুস্বাদিত কৃষ্ণস্বরূপ। শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন; আবার জীবকে ভজন শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত তিনি ভক্তভাবও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অঙ্গীকার করিয়াছেন। তথাপি, নবদ্বীপ-লীলায় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-ভাব যে একেবারে অপ্রকট, তাহা নহে। শ্রীমন্-মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণভাবে তৈরিকব্রাহ্মণাদির সেবায় দাস্যরস, রামাই, সুন্দরানন্দ, গৌরীদাস, অভিরামাদির সঙ্গে সখ্যরস, শ্রীশচীমাতা ও মিশ্রপুরন্দরের সঙ্গে বাৎসল্যরস এবং গদাধরাদি সহচরগণের সঙ্গে সুরধুনীতে নৌকাবিলাসাদিতে মধুর-রসও আশ্বাদন করিয়াছেন। এসম্বন্ধে মহাজনোক্তিই প্রমাণ। গোষ্ঠলীলার গৌরচন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায় :—
“আজুরে গৌরাজের মনে কি ভাব উঠিল। ধবলী সাঙলী বলি সযনে ডাকিল ॥ শিঙ্গা বেগু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি। হৈ হৈ বলিয়া গোরা ঘুরায় পাঁচনী ॥” আবার,—“গৌর কিশোর, পূরব-রসে গরগর, মনে ভেল গোষ্ঠ-বিহার। দাম শ্রীদাম, সুবল বলি ডাকই, নয়নে গলয়ে জলধার ॥ বেত্র বিশাল, সাজ লেই যাজন, যায়ব ভাতীর সমীপ। গৌরীদাস, সাজ করি তৈখনে, গৌর নিকটে উপনীত ॥” শিঙ্গা-বেগু-মুরলী-বেত্র-বিশাল-সাজে সজ্জিত হইয়া দাম-শ্রীদাম-সুবলাদিকে সঙ্গে লইয়া হৈ হৈ রবে ধবলী-শুমলী-আদি গাভীগণকে ফিরাইয়া শ্রীকৃষ্ণই ভাতীরাদি বন-সমীপে গোচারণে গিয়া থাকেন—শ্রীরাধিকা এভাবে গোচারণে যাতেন না। তাই স্পষ্টই বুঝা যায়, ঐ সমস্ত পদে গৌরের শ্রীকৃষ্ণভাবই প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীনিমাইচাঁদের মৃদভক্ষণ, কালোহাঁড়ীর স্তূপে উপবেশন, গৃহের জিনিব-পত্রের অপচয়, গঙ্গাঘাটাদিতে ছুরস্তপনার দক্ষণ মিশ্রপুরন্দরকর্তৃক শ্রীনিমাইয়ের-শাসন-প্রভৃতি বাল্যলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণভাবে বাৎসল্য-রসাস্বাদনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণভাবে প্রভুর মধুর রসাস্বাদনের দৃষ্টান্তও মহাজনের পদে দেখিতে পাওয়া যায়। নৌকা-বিলাসের গৌরচন্দ্রে :—“না জানিয়ে গৌরাচাঁদের কোন্ ভাব মনে। সুরধুনী-তীরে গেলা সহচর-সনে ॥ প্রিয় গদাধর-আদি সঙ্গেতে করিয়া। নৌকায় চড়িল গৌর প্রেমাবেশ হৈয়া ॥ আপনি কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকাখানি। ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্জে সবে পানি ॥” আবার, “আরে মোর গৌরাজ নায়। সুরধুনী মাঝে যাইয়া, নবীন নাবিক হৈয়া, সহচর মেলিয়া খেলায় ॥ প্রিয়-গদাধর-সঙ্গে, পূরব রতন রঙ্গে, নৌকায় বসিয়া করে কেলি। ডুব ডুব করে না, বহায় বিষম বা, দেখি হাসে গোরা-বনমালী ॥” এই শেষোক্তপদে প্রভুকে “গোরা-বনমালী” বলাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রভু কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন; গোরা-বনমালী গোরারূপ বনমালী (কৃষ্ণ), বনমালীর (কৃষ্ণের) ভাবে আবিষ্ট গৌরা। বিশেষতঃ, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণই যমুনাগর্ভে নৌকা ভাসাইয়া “আপনি কাণ্ডারী হইয়া” নৌকা বাহিয়াছিলেন এবং “বিষম বাতাস বহাইয়া নৌকা খানিকে ডুব ডুব করিয়াছিলেন।” শ্রীমতীরাধিকা একরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া কেনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

তারপর, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগোচিত গৌরচন্দ্রে আরও পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায় :—“আরে মোর গৌরা বিজমণি। রাধা রাধা বলি কানে লোটায় ধরণী ॥ রাধানাম জপে গৌরা পরম যতনে। সুরধুনী-ধারা বহে অরুণ নয়নে ॥ খেনে খেনে গৌরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। রাধা নাম বলি খেনে খেনে মুকুছায় ॥”—শ্রীরাধার বিরহে কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ রাধানাম জপ করিতেন, রাধা রাধা বলিয়া কান্দিতেন ও ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঠিক সেই ভাবই উক্ত পদে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

উপরে যে সমস্ত মহাজনী পদ উল্লিখিত হইল, তৎসমস্তই শ্রীনবদ্বীপ-লীলার পদ; নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যে শ্রীকৃষ্ণ-ভাবও উদ্ভূত হইত, উক্তপদ সমূহে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। সেই প্রভুই যখন নীলাচলে গিয়াছেন, তখন নীলাচলেও যে সময় সময় তাঁহার চিন্তে শ্রীকৃষ্ণভাব স্মৃতিত হইত, ইহা মনে করা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপতঃ তো শ্রীকৃষ্ণই; শ্রীকৃষ্ণের ভাব তাঁহার স্বরূপগত ভাব। তিনি একাধারে বিষয় এবং আশ্রয় উভয়ই। অমুকুল উদ্ভীপনাদির প্রভাবে সময় সময় নীলাচলেও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভাব (বিষয়ের ভাব) স্মৃতিত হওয়া অসম্ভব নহে। আলোচ্য পয়ারের ধ্বনিতেও তাহাই বুঝা যাইতেছে।

পূর্ব যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান ।
তৈছে স্বরূপগোসাঞি রাখে মহাপ্রভুর প্রাণ ॥ ৯
এই দুইজন্য মৌভাগ্য কহেন না যায় ।

‘প্রভুর অন্তরঙ্গ’ করি যারে লোকে গায় ॥ ১০
এইমত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ ।
এবে শুন ভক্তগণ । রঘুনাথ মিলন ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

প্রশ্ন হইতে পারে, নীলাচলেও যদি সময় সময় প্রভুর শ্রীকৃষ্ণভাব ক্ষুরিত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে কবিরাজ-গোস্বামী তাহার উল্লেখ করিলেন না কেন? উত্তর—শ্রীরাধার ভাবে প্রভুর চিত্ত এতই গাঢ়রূপে আবিষ্ট হইত যে, শ্রীরাধা-ভাবেরই প্রাধান্য অধিকাংশ সময়ে থাকিত; শ্রীকৃষ্ণভাব সাময়িক ভাবে মাত্র কখনও কখনও ক্ষুরিত হইত। রাধাভাবোচিত লীলাদিই প্রভুর মুখ্য আশ্বাস্ত বলিয়া এবং প্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলায় রাধাভাবই সম্যক্ প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামী দিব্যোন্মাদজনিত প্রলাপোক্তিরই সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রভুর এই দিব্যোন্মাদ-লীলা রাগাছুগামার্গীয় মধুর-ভাবের উপাসকের উপসনার অমুকূল বলিয়াও হয়তো সাধকের প্রতি কৃপা করিয়া কবিরাজ-গোস্বামী তাহাই সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। তিনি নিজেও হয়ত রাধাভাব-হ্রাস-স্বলিত গৌরের আনুগত্যে ঐ লীলায় আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া প্রভুর কৃষ্ণভাবোচিত লীলার প্রতি তাঁহার তত অনুসন্ধানও ছিল না। আলোচ্য পয়ারে ভঙ্গীতে তাহার ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন।

যাহা হউক, উক্ত আলোচনার সঙ্গে শ্রীচরিতামৃতের—“স্বল যৈছে পূর্বে কৃষ্ণসুখের সহায় । গৌরসুখদানহেতু তৈছে রামরায় ॥”—এই পয়ারটি মিলাইয়া অর্থ করিলে এই পয়ারের মর্ম এইরূপ হইবে বলিয়া মনে হয় :—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের ভাবে যখন রাধা-বিরহে কাতর হইতেন, তখন রামানন্দরায় সুবলের ভাবে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া আশ্বস্ত করিতেন। কিন্তু শ্রীরাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তিনি যখন অধীর হইয়া পড়িতেন, তখন রামানন্দ বিশাখার ভাবেই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন।”

শারদীয়-মহারাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলে তাঁহার বিরহে উদ্ভ্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি চিন্তা করিতে করিতে কোনও কোনও গোপী যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণবৎ আচরণ বা শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন, রাধাভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুও কৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া তদ্রূপ কৃষ্ণভাবের আবেশে পূর্বোন্মিত নৌবিলাসাদি লীলা করিয়াছিলেন—এইরূপ মনে করিয়াও কান্তাভাবের উপাসকগণ পূর্বোক্ত লীলাদি আশ্বাদন করিতে পারেন। ২২৩৮১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯। পূর্বপয়ারে রামানন্দ রায়ের ভাবের কথা বলিয়া এই পয়ারে স্বরূপ-দামোদরের ভাবের কথা বলিতেছেন।

ব্রজলীলায় কৃষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধার পক্ষে তাঁহার প্রিয়সখী ললিতাই যেমন প্রধান সহায়-স্বরূপিণী ছিলেন, তদ্রূপ গৌরলীলায়ও স্বরূপ-দামোদরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাধাভাবে কৃষ্ণবিরহ-কাতরতার সময়ে প্রভুর প্রধান সহায়-স্বরূপ ছিলেন—ললিতা শ্রীরাধাকে যে ভাবে সান্ত্বনা দিতেন, স্বরূপ-দামোদরও সেইভাবে কৃষ্ণবিরহ-কাতর প্রভুর সান্ত্বনা বিধান করিতেন।

স্বরূপ-দামোদর যে ব্রজলীলায় ললিতা ছিলেন, এই পয়ারে তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এজ্জই বোধ হয় শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামিপাদও লিখিয়াছেন, “শ্রীললিতা স্বরূপ-দামোদরতাং প্রাপ্তা গৌর-রসে তু যা ॥—ললিতা গৌররসে নিমগ্না হইয়া স্বরূপ-দামোদরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।” কিন্তু গৌর-গণোদ্দেশ্য দীপিকার মতে ব্রজের বিশাখাই গৌর-লীলায় স্বরূপ-দামোদর হইয়াছেন। “যা বিশাখা ব্রজে পুরা। সাথ স্বরূপগোস্বামী তত্ত্বভাব-বিলাসবান্ ॥” ইহাতে বুঝা যায়, স্বরূপদামোদরে বিশাখার ভাবও কিছু ছিল।

১০। এই দুইজন্য—স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দের। প্রভুর অন্তরঙ্গ ইত্যাদি—লোকে এই দুই জনকে প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্শ্ব বলিয়া কীর্তন করেন।

১১। বিহরে—বিহার করেন, লীলা করেন। রঘুনাথ-মিলন—যে ভাবে রঘুনাথদাস মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে মিলিত হইয়াছেন, তাহা।

পূর্বের শান্তিপু্রে রঘুনাথ যবে আইলা ।
 মহাপ্রভু রূপা করি তারে শিক্ষাইলা ॥ ১২
 প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজঘরে যায় ।
 মর্কটবৈরাগ্য ছাড়ি হৈলা বিষয়ীর প্রায় ॥ ১৩
 ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্বকর্ম ।

দেখিয়া ত মাতা-পিতার আনন্দিত মন ॥ ১৪
 ‘মথুরা হইতে প্রভু আইলা’ বার্তা যবে পাইল ।
 প্রভুপাশে চলিবারে উদ্যোগ করিল ॥ ১৫
 হেনকালে মুলুকের এক স্লেচ্ছ অধিকারী ।
 সপ্তগ্রাম-মুলুকের সে হয় চৌধুরী ॥ ১৬

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১২। পূর্বের শান্তিপু্রে—মহাপ্রভু গোড়দেশ হইয়া শ্রীকৃন্দাবন যাওয়ার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তখন শান্তিপু্রে গিয়াছিলেন; শান্তিপু্র হইতে যাত্রা করিয়া কানাইর নাটশালা পর্যন্ত যাইয়া পুনরায় শান্তিপু্রে ফিরিয়া আসিলেন; এইবার প্রভু দশদিন শান্তিপু্রে ছিলেন। এই সময়ে রঘুনাথদাস প্রভুর চরণ দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে শান্তিপু্রে গিয়াছিলেন। তারে শিক্ষাইলা—প্রভু তখন রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন—“স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব-সিন্ধুকুল ॥ মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া ॥ অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার। অচিরেতে কৃষ্ণ তোমার করিবে উদ্ধার ॥ ২।১৬।২৩৫-৩৭ ॥”

১৩। তেঁহো—রঘুনাথ দাস।

মর্কট বৈরাগ্য—মর্কটের ছায় বহির্বৈরাগ্য। অ২।১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। যাহাদের ভিতরে বিষয়-মল্লি, কিন্তু বাহিরে বৈরাগ্যের বেশ, তাহাদের বৈরাগ্যকেই মর্কট-বৈরাগ্য বলে। রঘুনাথের বৈরাগ্য বাস্তবিক তদ্রূপ ছিল না; তাঁহার চিন্তে ভোগামল্লি ছিল না; প্রভু তাঁহাকে কেবল বাহ্য বৈরাগ্য ত্যাগ করিতেই বলিয়াছেন, অর্থাৎ প্রভু বলিলেন—বাহিরে এমন কোন আচরণ দেখাইবে না, যাহা দেখিয়া লোকে বুঝিতে পারে যে, ভিতরে তোমার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে।

বিষয়ীর প্রায়—বিষয়ীর মতন। রঘুনাথ “বিষয়ীর মতন” হইলেন, কিন্তু “বিষয়ী” হইলেন না; তিনি প্রভুর উপদেশানুসারে, অনাসক্তভাবে সমস্ত বিষয়-কর্ম করিতে লাগিলেন; তাহাতে লোকে মনে করিল, তিনি আবার বিষয়ে মন দিয়াছেন, বিষয়ী হইয়াছেন; বস্তুতঃ কিন্তু তিনি মোটেই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন নাই, বাহিরে যত্নের মত কাজ-কর্ম করিয়া যাইতেছিলেন মাত্র; তাঁর মন ছিল সর্বদা শ্রীচৈতন্য-চরণে।

১৪। আনন্দিত মন—পুত্র বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়াছেন, স্ততরাং আর গৃহত্যাগের সম্ভাবনা নাই, ইত্যাদি মনে করিয়া পিতামাতার আনন্দ হইল।

১৫। মথুরা হইতে প্রভু আইলা—প্রভু মথুরা হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, এই সংবাদ শুনিয়া। প্রভু শান্তিপু্রে রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন, “আমি—কৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে। তবে তুমি আমাপাশ আসিহ কোন ছলে ॥ ২।১৬।২৩৮॥” এই আশায় বুক বাঁধিয়া রঘুনাথ এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন যখন শুনিলেন, প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখনই প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

১৬। মুলুক—কতকগুলি পরগণা লইয়া একটা মুলুক হয়।

সপ্তগ্রাম-মুলুক—রঘুনাথের পিতা-জ্যেষ্ঠা হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস সপ্তগ্রামে বাস করিতেন; সপ্তগ্রামে থাকিয়া তাঁহারা যে মুলুক শাসন করিতেন, তাহার নাম ছিল “সপ্তগ্রাম-মুলুক।” সপ্তগ্রাম-মুলুক সাতটা গ্রামের সমষ্টিমাত্র ছিল না। বর্তমান হুগলী, হাওড়া, কলিকাতা ও চব্বিশপরগণা জেলা এবং বর্দ্ধমান-জেলার কয়দংশ এই সপ্তগ্রাম-মুলুকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোগল-সম্রাট আকবরের সময়ে রাজস্ব-মন্ত্রী টোডরমল্লের সেরেস্ভায় সপ্তগ্রাম একটা রাজস্ব-সরকারে ভুক্ত ছিল।

হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া ।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া ॥ ১৭
বার লক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বিশলক্ষ ।

সেই তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥ ১৮
রাজঘরে কৈফিতি দিয়া উজীর আনিল ।
হিরণ্যমজুমদার পলাইল, রঘুনাথেরে বান্ধিল ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টকা ।

মুসলমান রাজত্বের সময়ে সপ্তগ্রাম মুসলমান-শাসন-কর্তাদের রাজধানী ছিল ; এখানে টাকশালও ছিল, তাহাতে মুদ্রা প্রস্তুত হইত । এই মুসলমান-শাসনকর্তারা নামে মাত্র মোগল-সম্রাটদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন, প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহারা সম্রাটকে গ্রাহ্যও করিতেন না, সম্রাটের সরকারে রীতিমত রাজস্বও আদায় করিতেন না । ফলতঃ তাঁহারা সপ্তগ্রামের প্রকৃত অধীশ্বর ছিলেন ।

এই সময়ে ঐ অঞ্চলে একটা কায়স্থ-পরিবার অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন ; হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস নামে দুই সহোদর এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন । অতি অল্পকাল-মধ্যেই দুই সহোদর রাজকাণ্ডে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । মুসলমান শাসনকর্তাদের অত্যাচারে হিন্দুদের বিশেষ কষ্ট হইতেছে দেখিয়া ইহারা সপ্তগ্রাম-মুলুক মোক্তাস্থত্রে বন্দোবস্ত পাইবার নিমিত্ত রাজ-দরবারে দরখাস্ত করেন । মোক্তা—কতকটা ইজাড়া বন্দোবস্তের মত ; যাহারা মোক্তা-স্থত্রে কোনও মহল বন্দোবস্ত নিতেন, রাজসরকারে একটা নির্দিষ্ট বার্ষিক জমা দিতে পারিলেই তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইতেন ; নির্দিষ্ট জমা ব্যতীত রাজসরকারের সহিত তাঁহাদের আর কোনও সম্বন্ধই থাকিত না । তাঁহারা মোক্তা-মহাল যথেষ্টভাবে শাসন করিতে পারিতেন ; তাহাতে রাজা কোনও আপত্তি করিতেন না ।

যাহা হউক, হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস মোক্তা-বন্দোবস্তের দরখাস্ত করিলে রাজা বিবেচনা করিলেন যে, পূর্ববর্তী মুসলমান-শাসনকর্তারা তো এক পয়সাও রাজস্ব দেয় না, তাহারা বিদ্রোহী তুল্য । হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের নিকট হইতে যদি প্রতিবর্ষে একটা নির্দিষ্ট জমা পাওয়া যায়, তাহাতে লাভেরই কথা । ফলতঃ তাঁহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হইল ; বারলক্ষ টাকা বার্ষিক খাজনায় তাঁহারা সপ্তগ্রাম-মুলুক বন্দোবস্ত পাইলেন । ইহাতে পূর্ববর্তী মুসলমান-শাসনকর্তাদের মুলুকের উপর আধিপত্য নষ্ট হইল ; তাঁহারা এই হিন্দু-পরিবারের চিরশত্রু হইয়া উঠিলেন ।

সপ্তগ্রাম বর্তমান কলিকাতা হইতে বেশী দূরে নহে ; ত্রিশবিঘা রেলওয়ে-স্টেশন কলিকাতা হইতে ২৭ মাইল দূরে ; সপ্তগ্রাম ত্রিশবিঘার অতি নিকটে ।

সে হয় চৌধুরী—ঐ স্লেচ্ছ অধিকারী (পূর্ববর্তী মুসলমান-শাসনকর্তা) সপ্তগ্রামের একজন প্রধান ব্যক্তি ; তিনিই হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের পূর্বে সপ্তগ্রাম-মুলুকের শাসনকর্তা ছিলেন ।

(হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন দাসাদির ঐতিহাসিক বিবরণ শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রণীত “শ্রীমদাসগোস্বামী” অবলম্বনে লিখিত) ।

১৭। মোকতা—মোক্তা । পূর্ববর্তী পয়সার টকা দ্রষ্টব্য । তার অধিকার গেল—মুসলমান-চৌধুরীর আধিপত্য নষ্ট হইল । পূর্ববর্তী ১৬ পয়সার টকা দ্রষ্টব্য । মরে সে দেখিয়া—সপ্তগ্রাম-মুলুকে মুসলমান চৌধুরীর অধিকার নষ্ট হইল দেখিয়া চৌধুরী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন । দীর্ঘায় জলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন ।

১৮। বার লক্ষ ইত্যাদি—হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস মুলুক হইতে বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করিতেন ; কিন্তু রাজ-সরকারে মাত্র বার লক্ষ টাকা খাজনা দিতেন ; আর বার্ষিক আটলক্ষ টাকা তাঁহাদের লাভ থাকিত ।

সেই তুড়ুক—তুরস্ক-দেশীয় সেই মুসলমান চৌধুরী । কিছু না পাঞা—মুলুকের আয় হইতে কিছু মাত্র না পাইয়া । হৈল প্রতিপক্ষ—নিজের স্বার্থ নষ্ট হওয়ায় হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন ।

১৯। রাজঘরে—রাজার দরবারে । অন্ত্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস গোড়েশ্বর নবাবের সরকারেই বারলক্ষ টাকা খাজনা দিতেন । “গোপাল চক্রবর্তী নাম এক ব্রাহ্মণ । মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা প্রধান ॥ গোড়ে রহে পাংশাহা-আগে আরিন্দা গিরি করে । বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাংশার ঠাঞি

প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভৎসনা—।

বাপ-জ্যেষ্ঠা আনহ, নহে পাইবি যাতনা ॥ ২০

মারিতে আনয়ে যদি দেখে রঘুনাথে ।

মন ফিরি যায়, তাতে না পারে মারিতে । ২১

বিশেষে কায়স্থ-বৃত্তি অন্তরে করে ডর ।

মুখে তর্জ-গর্জ করে, মারিতে সভয় অন্তর ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টাকা ।

ভরে ॥ ৩৩:৭৮-৭৯ ॥” সুতরাং এস্থলে রাজঘর-শব্দে গোঁড়েশ্বর নবাবের দরবারই বুঝিতে হইবে। নবাবের নিকট হইতেই হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস সপ্তগ্রাম-মুলুক মোকতা করিয়া নিয়াছেন। কৈফিতি দিয়া—কৈফিয়ৎ দিয়া ; মুসলমান-চৌধুরী নবাব-দরবারে জানাইলেন যে, হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস মুলুক হইতে বিশলক্ষ টাকা আদায় করেন, কিন্তু রাজ-সরকারে মাত্র বারলক্ষ টাকা রাজস্ব দেন ; এই রাজস্ব অতি অল্প ; রাজস্ব আরও বেশী হওয়া উচিত। হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের অনিষ্টসাধনের নিমিত্তই জাতক্ৰোধ মুসলমান-চৌধুরী এরূপ করিয়াছিলেন। উজীর—নবাবের প্রধান কর্মচারী। হিরণ্যমজুমদার পলাইল—মুসলমান-চৌধুরীর কুচক্র যখন সপ্তগ্রামে উজীর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ভয়ে হিরণ্যদাস পলায়ন করিলেন। ঐ সঙ্গে সম্ভবতঃ গোবর্দ্ধন দাসও পলাইয়াছিলেন ; নচেৎ গোবর্দ্ধনদাসকে না বাঁধিয়া উজীর যুবক রঘুনাথকে বাঁধিয়া নিবেন কেন ? পরবর্তী পয়ারের “বাপ-জ্যেষ্ঠা আন” এইরূপ উক্তিও ইহার অমুকুল।

রঘুনাথেরে বাঁধিল—হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসকে না পাইয়া উজীর রঘুনাথদাসকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেলেন। রঘুনাথ-দাস গোবর্দ্ধন-দাসের একমাত্র পুত্র ছিলেন।

২০। উজীর রঘুনাথকে নিয়া সম্ভবতঃ কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন ; তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠা কোথায় আছেন, বলিয়া দিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদিগকে আনিয়া দিবার নিমিত্ত সেইস্থানে পূর্বোক্ত স্নেহ-চৌধুরী প্রত্যহই তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পিতা-জ্যেষ্ঠাকে ধরিবার উপায় বলিয়া না দিলে তাঁহাকে যে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এরূপ ধমকও তিনি দিতে লাগিলেন। কিন্তু এসব তিরস্কার এবং ধমক সত্ত্বেও রঘুনাথ অবিচলিত রহিলেন ; তিনি বোধ হয় অমূল্য শ্রীচৈতন্য-চরণাবিন্দই চিন্তা করিতেছিলেন।

পরবর্তী ৩৬:২৮-৩০ পয়ারের মর্ম হইতে বুঝা যায়, সপ্তগ্রামের পূর্বতন অধিকারী স্নেহ-চৌধুরীই রঘুনাথদাসকে ভৎসনাদি করিতেন এবং উৎপীড়নের ভয় দেখাইতেন। উজীর রঘুনাথের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ আচরণে বিরক্ত হইবেন না, এই ভরসা এই স্নেহ চৌধুরীর ছিল ; যেহেতু, তিনি উজীরের উদ্দেশ্যসিদ্ধির আবহুকূল্যই করিতেছিলেন।

২১। রঘুনাথ পিতা-জ্যেষ্ঠার কোনও সংবাদ দিতেছেন না দেখিয়া স্নেহ চৌধুরী মনে করিলেন, তাঁহাকে কোনওরূপ শারীরিক যন্ত্রণা (প্রহারাদি) দিলে সমস্ত কথা প্রকাশ করিবেন। এইরূপ মনে করিয়া তিনি রঘুনাথকে উৎপীড়ন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের নিকটে আনিলেন ; কিন্তু রঘুনাথের ভক্তি-সমুজ্জ্বল ও প্রশান্ত মূর্তি দেখিলে তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া যাইত, তিনি আর প্রহারাদির আদেশ দিতে পারিতেন না। মন ফিরি যায়—প্রহারাদি শারীরিক উৎপীড়নের প্রবৃত্তি দূর হইয়া যায়।

২২। রঘুনাথের মুখ দেখিলে স্নেহ চৌধুরীর দয়া জন্মে ; তাতে তাঁহাকে প্রহার করিবার নিমিত্ত আদেশ দিতে পারেন না। প্রহারের আদেশ না দেওয়ার আর একটা কারণও ছিল। তিনি কায়স্থ-জাতির কুটবুদ্ধিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন ; রঘুনাথ কায়স্থ ; বিশেষতঃ, তাঁহার পিতা-জ্যেষ্ঠা অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ ও জনপ্রিয় লোক ছিলেন। রঘুনাথের দেহের উপর কোনওরূপ অত্যাচার করিলে তাঁহার পিতা-জ্যেষ্ঠা ইহার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে যদি একটা অনর্থের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই ভয়েও রঘুনাথকে প্রহারাদি করার আদেশ দিতে পারিতেন না ; তাই কেবল মুখেই তর্জন গর্জন করিতেন, প্রহারাদির আদেশ দিতেন না।

কায়স্থ-বৃত্তি—কোন কোন গ্রন্থে “কায়স্থ-বুদ্ধি” পাঠ আছে। জাতিতে কায়স্থ বলিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসের

তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায় ।
 বিনতি করিয়া বোলে সেই স্নেহ-পায়—॥ ২৩
 আমার পিতা-জ্যেষ্ঠা হয় তোমার দুইভাই ।
 ভাই-ভাই কলহ করহ সর্বথাই ॥ ২৪
 কভু কলহ কভু প্রীত, ইহার নিশ্চয় নাঞি ।
 কালি পুন তিনভাই হবে একঠাঞি ॥ ২৫
 আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক ।
 আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক ॥ ২৬

পালক হঞা পাল্যেতে তাড়িতে না জুয়ায় ।
 তুমি সর্বশাস্ত্র জান জিন্দাপীর-প্রায় ॥ ২৭
 এত শুনি সেই স্নেহের মন আর্দ্র হৈল ।
 দাড়ি বাহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল ॥ ২৮
 স্নেহ কহে—আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র ।
 আজি ছাড়াইমু তোমা করি এক সূত্র ॥ ২৯
 উজীরে কহিয়া রঘুনাথে ছোড়াইল ।
 প্রীত করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল—॥ ৩০

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা ।

১২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীরঘুনাথদাসকে কায়স্থ বলিরা উল্লেখ করিয়াছেন । “শ্রীরঘুনাথদাসো নাম গোড়কায়স্থকুলাজ্ঞভাস্করঃ পরমভাগবতঃ ইত্যাদি ।” অন্তরে—মনে । ডর—ভয় ।

২৩। নিজেকে অনেক তর্জন গর্জন শুনিতে হইতেছে বলিয়া রঘুনাথের কোনও চিন্তা ছিল না ; কিন্তু তাঁহার বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার পিতা-জ্যেষ্ঠা হয়তো অনেক মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছিলেন । তাঁহাদের কষ্ট দূর করিবার উদ্দেশ্যে নিজের মুক্তি সম্বন্ধে রঘুনাথ একটা উপায় নির্ধারণ করিলেন । তীক্ষ্ণবুদ্ধি রঘুনাথ সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে স্নেহ-চৌধুরী একটু ভয় পাইতেছেন ; বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি সেই স্নেহের দয়া হইতেছে বলিয়াও বোধ হয় তিনি মনে করিলেন । তাই বিনয়াদি দ্বারা তাঁহাতে দয়ার সম্যক উদ্রেক করিয়া তিনি নিজের মুক্তিসাধনের উপায় স্থির করিয়া স্নেহ-চৌধুরীর চরণে নিজের কথাগুলি সবিনয়ে নিবেদন করিলেন । বিনতি—বিনয় । সেই স্নেহ-পায়—সেই মুসলমান চৌধুরীর চরণে ।

২৪-২৭। “আমার পিতা-জ্যেষ্ঠা” হইতে “জিন্দাপীর প্রায়” পর্য্যন্ত চারি পয়ায়ে মুসলমান চৌধুরীর নিকটে রঘুনাথের বিনয়োক্তি ব্যক্ত করা হইয়াছে ।

রঘুনাথ বলিলেন—“হজুর ! আমার পিতা এবং জ্যেষ্ঠা আপনারই আত্মতুল্য । সব জায়গায়ই ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ করিয়া থাকে ; কখনও কলহ হয়, কখনও বা মেলামেশিও হয় ; সব সময় একরূপ তাব থাকে না । এখন আপনার তিন ভাইয়ের কলহ হইয়াছে সত্য, দুদিন পরেই কলহ যাইবে, তিন জনের মেলামেশি হইবে । আমি যেমন আমার পিতার বালক, স্নেহের পাত্র, তদ্রূপ আপনারও বালকতুল্য স্নেহের পাত্র । আপনিও আমার পিতার তুল্য পালক, আমিও আপনার পাল্য । পালক হইয়া পাল্যকে তাড়না করা সম্ভব নহে ; আপনি নিজেই সব জানেন, সব বুঝিতে পারেন ; আপনি মুখ নহেন, সমস্ত শাস্ত্রবাক্যও আপনার জানা আছে । আপনি অধার্মিকও নহেন, আপনাকে আমি জীবন্ত পীর (সিদ্ধ-মহাপুরুষ) বলিয়াই মনে করি । এমতাবস্থায় আপনার নিকটে আমার এসব কথা বলা নিশ্চয়োজ্ঞান, বালকোচিত বাচালতা মাত্র ।” ২৫ পয়ায়ের স্থলে একরূপ পাঠান্তর আছে :—“ভাই ভাই কলহ আছে সর্বঠাঞি । কোতুক কলহ প্রীত নিশ্চয় কিছু নাঞি ॥” জিন্দাপীর—জীবন্তপীর (জীবন্ত সিদ্ধ-মহাপুরুষ) । জিন্দাপীর প্রায়—জিন্দাপীরের তুল্য ।

২৮। মন আর্দ্র হৈল—চিত্ত কোমল হইল ; মন গলিয়া গেল । অশ্রু—চক্ষুর জল ।

রঘুনাথের বিনয়োক্তি শুনিয়া স্নেহ-চৌধুরীর মন গলিয়া গেল, তাঁহার চক্ষুদিয়া জল পড়িতে লাগিল, সেই জলে তাঁহার দাড়ি ভিজিয়া গেল, তিনি কান্দিতে লাগিলেন ।

২৯। স্নেহ কহে—মুসলমান চৌধুরী । সূত্র—কোশল ।

৩০। সেই মুসলমান চৌধুরী নবাবের উজীরকে বলিয়া রঘুনাথকে মুক্ত করিলেন ।

তোমার জ্যেষ্ঠা নির্বুদ্ধি—অটলক্ষ খায় ।
 আমিহো ভাগী, আমারে কিছু দিবারে জুয়ায় ॥ ৩১
 যাহ তুমি, তোমার জ্যেষ্ঠা মিলাই আমারে ।
 যেই ভাল হয় করুন, তার দিল তাঁরে ॥ ৩২
 রঘুনাথ আসি তবে জ্যেষ্ঠা মিলাইল ।
 স্নেহসহিত অম্বরস সব শাস্ত হৈল ॥ ৩৩
 এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল ।
 দ্বিতীয়-বৎসরে পলাইতে মন কৈল ॥ ৩৪
 রাত্রে উঠি একলা চলিল পালাইয়া ।
 দূরে হৈতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া ॥ ৩৫
 এইমত বার বার পালায়, ধরি আনে ।

তবে তার মাতা কহে তার পিতার স্থানে—॥ ৩৬
 পুত্র বাতুল হৈল, ইহায় রাখহ বান্ধিয়া ।
 তার পিতা কহে তারে নির্বিঘ্ন হইয়া—॥ ৩৭
 ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, স্ত্রী অপ্সরাসম ।
 এ-সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন ॥ ৩৮
 দড়ীর বন্ধনে তারে রাখিবে কেমনে ?
 জন্মদাতা পিতা নারে প্রারদ্ধ ঘুচাইতে ॥ ৩৯
 চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হৈয়াছে ইহারে ।
 চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে ? ॥ ৪০
 তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে ।
 নিত্যানন্দগোসাঞির পাশ চলিলা আরদিনে ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৩১-৩২ । “তোমার জ্যেষ্ঠা” হইতে “তার দিল তাঁরে” পর্যন্ত দুই পয়ারে চৌধুরী রঘুনাথকে বলিলেন—
 “আজ হইতে তুমি আমার পুত্র ; কিন্তু তোমার জ্যেষ্ঠা নির্বোধ ; মোক্তাশ্বত্বের মূলুক হইতে তিনি আটলক্ষ টাকা লাভ
 পায়েন ; আমি তাঁহার ভাই বলিয়া ঐ আট লক্ষের অংশ আমিও পাইতে পারি ; আমাকে তাহার কিছু অংশ দেওয়া
 উচিত ; কিন্তু তিনি আমাকে কিছু না দিয়া নিজেই আটলক্ষ টাকা ভোগ করিতেছেন । যাহা হউক, তুমি বাড়ীতে
 যাও, তোমার জ্যেষ্ঠাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও । এই সম্বন্ধে তিনি যাহা ভাল মনে করেন, করিবেন ; সমস্ত
 তার আমি তাঁহার উপরেই দিলাম ।”

অটলক্ষ—মোক্তা-মূলুকের মুনাফা আটলক্ষ টাকা । ভাগী—ভাই বলিয়া অংশীদার । দিবারে জুয়ায়—
 দেওয়া উচিত ।

৩৩ । জ্যেষ্ঠা মিলাইল—জ্যেষ্ঠাকে চৌধুরীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন । স্নেহসহিত—চৌধুরীর সহিত ।
 অম্বরস—আপোশ । কোনও কোনও গ্রন্থে “বশ কৈল” পাঠান্তর আছে ।

৩৪ । এইমত—নবাব-সরকারে গোলমাল চুকাইতে ।

৩৫ । পুত্র—রঘুনাথ । বাতুল—পাগল । নির্বিঘ্ন—দুঃখিত । ৩৬ । ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য—স্বর্গের রাজা
 ইন্দের ঐশ্বর্যের মত অতুল ঐশ্বর্য । স্ত্রী অপ্সরাসম—অপ্সরার মত পরমা সুন্দরী স্ত্রী । এসব—ঐশ্বর্য ও স্ত্রী ।

৩৭ । প্রারদ্ধ—পূর্বজন্মের ফলোন্মুখ কর্ম । পূর্বজন্মের স্মৃতির ফলে রঘুনাথের সংসারে বৈরাগ্য
 জন্মিয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে ; আমি তাহার জন্মদাতা পিতা মাত্র, কিন্তু আমি
 তাহার স্মৃতির ফল নষ্ট করিতে সমর্থ নহি ।

৪০ । চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা ইত্যাদি—রঘুনাথের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হইয়াছে ; তাই তাঁহার সংসারা-
 সক্তি নষ্ট হইয়াছে ; অতুল ঐশ্বর্য এবং পরমাসুন্দরী যুবতীভাষ্যাও তাই তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না ।
 চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল—শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ প্রাপ্তির নিমিত্ত পরম-উৎকর্ষায় যে উন্নতির মত হইয়াছে ।

৪১ । তবে—বার বার পলাইতে চেষ্টা করিয়াও ধরা পড়ার পরে । বিচারিলা মনে—রঘুনাথ বোধ হয়
 মনে মনে বিচার করিলেন যে, তাঁহার নিজের শক্তিতে ও চেষ্টায় তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে যাইতে পারিবেন
 না । যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হয়, তাহা হইলেই হয়তো তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে । ইহা ভাবিয়া তিনি
 একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে যাওয়ার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন ।

পানিহাটিগ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন ।
কীর্তনীয়া সেবকগণ সঙ্গে বহুজন ॥ ৪২
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপরে ।
বসি আছেন যেন কোটিসূর্য্যোদয় করে ॥ ৪৩
তলে উপরে বহুভক্ত হঞাছে বেষ্টিত ।

দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥ ৪৪
দণ্ডবৎ হঞা সেই পড়িলা কথোদূরে ।
সেবক কহে—রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥ ৪৫
শুনি প্রভু কহে—চোরা ! দিলি দরশন ।
আয় আয় আজি তোর করিমু দণ্ডন ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

৪২। পানিহাটিগ্রামে—চক্ষিশপরগণা জেলায় এই গ্রাম অবস্থিত । রঘুনাথ পানিহাটিতে শ্রীনিতাইচাঁদের দর্শন পাইলেন । প্রভুর সঙ্গে অনেক কীর্তনীয়া ও অনেক ভক্ত ছিলেন । পানিহাটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত । প্রভুর—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ।

৪৩। বৃক্ষমূলে—প্রভু একটা স্রবহৎ বটবৃক্ষ-মূলে একটা বেদীর উপরে বসিয়াছিলেন । এমন সময় রঘুনাথ যাইয়া উপস্থিত হইলেন । পিণ্ডী—বেদী । কোটিসূর্য্যোদয় করে—তখন প্রভুর অঙ্গের জ্যোতি কোটিসূর্য্যের জ্যোতির ছায় উজ্জ্বল হইয়াছিল ।

৪৪। তলে উপরে—বৃক্ষতলস্থিত পিণ্ডার উপরে ও নীচে । প্রভুর প্রভাব—কোটিসূর্য্যজিনি প্রভুর অঙ্গপ্রভা এবং বহু ভক্ত প্রভুর আনুগত্য করিতেছে, এসমস্ত প্রভাব ।

৪৫। সেবক কহে—সেবক প্রভুকে বলিল ।

৪৬। চোরা—চোর ; ইহা রঘুনাথের প্রতি শ্রীনিতাইচাঁদের অত্যন্ত স্নেহের উক্তি । শ্রীশ্রীগৌরচরণ লাভের জন্ম ষাঁহার অত্যন্ত উৎকর্ষা, তাঁহার প্রতি শ্রীনিতাইয়ের স্নেহ খুবই স্বাভাবিক । গৌর-কৃপার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীনিতাই-চাঁদই বলিয়াছেন—“আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি” এবং “যে জন গৌরান্ন ভজে সে যে আমার প্রাণেরে ।” কিন্তু নিতাইচাঁদের এই স্নেহময় উক্তির পশ্চাতে একটা গূঢ় রহস্যও আছে । ষাঁহার ধন, তাহাকে না জানাইয়া যদি কেহ সেই ধন লইয়া যায় বা লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে চোর বলে । শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিতাই-চাঁদেরই সম্পত্তি ; শ্রীনিতাইচাঁদ কৃপা করিয়া ষাঁহাকে শ্রীশ্রীগৌরের চরণ দেন, তিনিই পাইতে পারেন, অথো পাইতে পারে না । রঘুনাথ শ্রীনিতাইচাঁদকে না জানাইয়া, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার না করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ পাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন—দুইবার শাস্তিপুরে যাইয়া প্রভুর চরণ প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহার পরেও স্বগৃহ হইতে পলাইয়া গিয়া নীলাচলে গৌরচরণ-সান্নিধ্যে উপস্থিতির চেষ্টা করিয়াছিলেন । ইহাই শ্রীনিতাইকে না জানাইয়া তাঁহার সম্পত্তি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ প্রাপ্তির চেষ্টা, ইহাই রঘুনাথের পক্ষে শ্রীনিতাইচাঁদের ধন চুরির চেষ্টা । চুরির চেষ্টাতেও লোক চোর বলিয়া খ্যাত হয়, গৃহস্থের ঘরে সিঁদ কাটার পরে এবং ঘরে প্রবেশ করার পূর্বেই ষাঁহাকে পলাইয়া বাইতে হয়, কিম্বা গৃহস্থের হাতে ধরা পড়িতে হয়, তাহাকেও চোর বলা হয় । রঘুনাথ শ্রীনিতাইচাঁদের ধন চুরির চেষ্টা করিয়াছেন, এক্ষণে নিতাইচাঁদের হাতে ধরা পড়িয়াছেন ; তাই পরমদয়াল শ্রীনিতাই-চাঁদ তাঁহাকে “চোরা” বলিয়াছেন । গৌরচরণ-প্রাপ্তির পরম উৎকর্ষাতেই রঘুনাথের এইরূপ ব্যবহার ; তাই তাঁহার প্রতি নিতাইচাঁদের পরমস্নেহের উদ্বেক ; তাই তিনি স্নেহ ভরে তাঁহাকে “চোরা” বলিলেন । করিমু দণ্ডন—দণ্ড (শাস্তি) দিব । চোর ধরা পড়িয়াছে, কাজেই তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে । দণ্ডও অদ্ভুত ! মস্তকে চরণ ধারণ (৩৬।৪৭) এবং সগণে দধিচিড়া ভক্ষণ (৩৬।৫০) । রঙ্গিয়া নিতাইয়ের অদ্ভুত রঙ্গ !

গৌরচরণ প্রাপ্তির নিমিত্ত রঘুনাথের উৎকর্ষা দেখিয়া গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীনিতাইচাঁদের এতই আনন্দ হইয়াছে যে, তিনি যেন আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না । রঘুনাথের প্রতি কৃপার বশা যেন শ্রীনিতাইচাঁদের হৃদয়ে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং এই কৃপাবজ্রার উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইয়াই যেন শ্রীনিতাইচাঁদ রঘুনাথকে বলপূর্ব্বক

প্রভু বোলায়, তেঁহো নিকট না করে গমন ।
 আকর্ষিয়া তার মাথে প্রভু ধরিল চরণ ॥ ৪৭
 কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময় ।
 রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়—॥ ৪৮
 নিকটে না আইস মোর, ভাগ দূরে দূরে ।
 আজি লাগি পাইয়াছোঁ, দণ্ডিমু তোমারে ॥ ৪৯
 দধিচিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে ।
 শুনি আনন্দিত হৈল রঘুনাথ মনে ॥ ৫০
 সেইক্ষণে নিজলোক পাঠাইল গ্রামে ।
 ভক্ষ্যদ্রব্য লোকসব গ্রাম হৈতে আনে ॥ ৫১
 চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা ।
 সব আনি প্রভু আগে চৌদিগে ধরিলা ॥ ৫২
 ‘মহোৎসব’ নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন ।

আসিতে লাগিল লোক অসংখ্যগণন ॥ ৫৩
 আর আর গ্রাম হৈতে সামগ্রী মাগাইল ।
 শত দুই চারি হোলনা তাহাঁ আনাইল ॥ ৫৪
 বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ-সাতে ।
 এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে ॥ ৫৫
 একঠাণ্ডি তপ্তদুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া ।
 অর্দেক সানিল দধি চিনি কলা দিয়া ॥ ৫৬
 আর অর্দেক ঘনাবর্ত-দুগ্ধে ত সানিল ।
 চাঁপাকলা চিনি দ্ব্যত কপূর তাতে দিল ॥ ৫৭
 ধুতি পরি প্রভু যদি পিঁড়িতে বসিলা ।
 সাতকুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা ॥ ৫৮
 চৌতারা উপরে যত প্রভুর নিজ গণ ।
 বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলীবন্ধন ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

ধরিয়া আনিয়া তাঁহার মস্তকে শিব-বিরিক্খি-বাজিত স্বীয় অভয় চরণদ্বয় স্থাপন করিলেন এবং গৌরস্বর্কস্বর রঘুনাথের দধি-চিড়া-আদি দ্রব্য গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । রঘুনাথের এই দ্রব্য শ্রীনিতাইচাঁদ নিজেই ভোজন করিলেন না; শ্রীমন্মহাপ্রভুকেও ভোজন করাইয়াছিলেন (৩৬৭৮, ৮৩), ভাগ্যবান শ্রীরঘুনাথকেও নিজহস্তে মহাপ্রভুর তুচ্ছাবশেষ দিয়া কৃতার্থ করিলেন (৩৬৯৩) ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলায় তাঁহার লীলাশক্তি জীবশিকার নিমিত্ত শ্রীল রঘুনাথদাসের মধ্যে সাধক জীবের ভাব প্রকটিত করিয়া থাকিলেও শ্রীল রঘুনাথ জীবতত্ত্ব নহেন; তিনি নিত্যসিদ্ধপার্ষদ । গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে ব্রজলীলায় তিনি ছিলেন—রসমঞ্জরী; কেহ কেহ তাঁহাকে রতিমঞ্জরীও বলেন, আবার নামভেদে কেহ কেহ ভানুমতীও বলেন । “দাসশ্রীরঘুনাথশ্রু পূরীখ্যা রসমঞ্জরী । অমুং কেচিং প্রভাযন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্ । ভাচু-মত্যাখ্যা কেচিংদাহন্তং নামভেদতঃ ॥” গৌরগণোদ্দেশ । ১৮৬ ॥”

৪৭ । আকর্ষিয়া—প্রভু রঘুনাথকে টানিয়া আনিয়া কৃপাপূর্বক তাঁহার মাথায় নিজের চরণ ধারণ করিলেন ।

৪৯ । ভাগ দূরে দূরে—দূরে দূরে থাক ।

৫০ । দধি চিড়া ইত্যাদি—আমাকে এবং আমার সঙ্গে যত জন আছে, সকলকে তুমি দধি চিড়া খাওয়াও ; ইহাই তোমার দণ্ড । মোর গণে—আমার সঙ্গীয় লোকসকলকে ।

৫৪ । মাগাইল—অহুসন্ধান করিয়া আনাইল (মূল্য দিয়া) ।

হোলনা—মাটির মালমা (দধি চিড়া খাওয়ার নিমিত্ত) । “শতদুইচারি”—স্থলে “সহস্র সহস্র”-পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ।

৫৫ । মৃৎকুণ্ডিতা—মাটির গামলা ।

৫৬ । সানিল—মিশ্রিত করিল ।

৫৭ । ঘনাবর্ত দুগ্ধ—যে দুগ্ধ বেশী জাল দিয়া ঘন করা হইয়াছে । সানিল—মিশাইল ; ভিজাইল ।

৫৮ । পিঁড়িতে—পিণ্ডাতে ; বেদীতে । সাতকুণ্ডী—সাতটি (চিড়াপূর্ণ) মাটির বড় গামলা ।

৫৯ । চৌতারা—বাঁধান পিণ্ডার প্রশস্ত স্থান (চত্বর) । বড় বড় লোক—বিশিষ্ট লোকসকল । মণ্ডলী-বন্ধন—গোলাকার হইয়া ।

রামদাস ঠাকুর সুন্দরানন্দদাস গঙ্গাধর ।
 মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর ॥ ৬০
 ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস ।
 মহেশ গৌরীদাস আর হোড় কৃষ্ণদাস ॥ ৬১
 উদ্ধারণদত্ত আদি যত নিজগণ ।
 উপরে বসিলা সব, কে করে গণন ? ॥ ৬২
 শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা ।
 মান্য করি প্রভু সভায় উপরে বসাইলা ॥ ৬৩
 দুই-দুই মৃৎকুণ্ডিকা সভার আগে দিল ।
 একে দুগ্ধচিড়া আরে দধিচিড়া কৈল ॥ ৬৪
 আর যত লোক সব চোঁতরা তলানে ।
 মণ্ডলীবন্ধনে বৈসে নাহিক গণনে ॥ ৬৫
 একেক জনেরে দুই-দুই হোলনা দিল ।
 দধিচিড়া দুগ্ধচিড়া দুইতে ভিজাইল ॥ ৬৬
 কোন কোন বিপ্র উপরে ঠাঞি না পাইয়া ।
 দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে যাঞা ॥ ৬৭

তীরে স্থান না পাইয়া আর কথোজন ।
 জলে নাস্তি করে দধি-চিপটক ভক্ষণ ॥ ৬৮
 কেহো উপরে, কেহো তলে, কেহো গঙ্গাতীরে ।
 বিশজনা তিন ঠাই পরিবেশন করে ॥ ৬৯
 হেনকালে আইলা তাহাঁ রাঘবপণ্ডিত ।
 হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত ॥ ৭০
 নিসকুড়ি নানামত প্রসাদ আনিল ।
 প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিল ॥ ৭১
 প্রভুরে কহে—“তোমা-লাগি বলভোগ লাগাইল ।
 ইহাঁ উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল ॥” ৭২
 প্রভু কহে—এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন ।
 রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভোজন ॥ ৭৩
 গোপজাতি আমি, বল গোপগণ সঙ্গে ।
 আমি সুখ পাই এ পুলিনভোজন-রঙ্গে ॥ ৭৪
 রাঘবেরে বসাই দুই কুণ্ডী দেয়াইল ।
 রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইল ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

৬০ । “রামদাস-আদি” হইতে “কে করে গণন” পর্য্যন্ত ৬০-৬২ এই তিন পয়ারে প্রভুর নিজ পার্শ্বদেবের কয়েক জনের নাম বলিলেন, তাঁহারা সকলেই পিণ্ডার চত্বরের উপরে বসিয়াছিলেন ।

৬২ । নিজগণ—প্রভুর পার্শ্বদ ; যাঁহারা সর্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকেন ।

৬৪ । দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা—প্রত্যেককে দুইটা করিয়া মাটির মালসা দিলেন । একটিতে দুগ্ধ-চিড়া অপরটিতে দধিচিড়া । এখানে মৃৎকুণ্ডিকা অর্থ মালসা ।

৬৭ । গঙ্গাতীরে যাঞা—গঙ্গাগর্ভে জলের নিকটে যাইয়া ।

৬৯ । তিনঠাই—উপরে, তলে ও গঙ্গাজলে এই তিন যায়গায় । নিসকুড়ি—ফলমূলাদি । আনিল—রাঘব-পণ্ডিত বাড়ীতে থাকিতেই চিড়া-মহোৎসবের কথা শুনিয়াছিলেন ; তাই তিনি বাড়ী হইতে আসিবার সময় ফলমূলমিষ্টাদি অনেক নিসকুড়ি প্রসাদ লইয়া আসিয়াছিলেন । প্রসাদ—রাঘব পণ্ডিতের দেবিত শ্রীরাধারমণের প্রসাদ । বাঁটি দিল—ভাগ করিয়া দিলেন ।

৭২ । ঐ দিন মধ্যাহ্নে রাঘব-পণ্ডিতের গৃহে প্রভুর ভোজনের কথা ছিল ; তাই রাঘব এসব কথা বলিলেন ।

৭৪ । গোপজাতি আমি ইত্যাদি—ব্রজলীলার (বলরামের) ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু এসব কথা বলিলেন । ব্রজলীলায় সমস্ত রাখালগণকে লইয়া কৃষ্ণ-বলরাম একদিন যমুনা-পুলিনে পুলিন-ভোজন করিয়াছিলেন । পানিহাটির চিড়ামহোৎসবে প্রভুর সেই পুলিন-ভোজনের কথা মনে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজে গোপভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং উপস্থিত সকলকেও গোপ বলিয়া প্রভু মনে করিতে লাগিলেন ; সম্ভবতঃ, গঙ্গাকেও যমুনা বলিয়া প্রভুর ধারণা হইয়াছিল ।

পুলিন-ভোজন-রঙ্গে—পুলিন-ভোজনের কৌতুকে । নদীর তীরবর্তী স্থানকে পুলিন বলে ।

৭৫ । দ্বিবিধ—দুই রকমের ; দধিচিড়া ও দুগ্ধ-চিড়া ।

সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল ।
 ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল ॥ ৭৬
 মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিল ।
 তাঁরে লঞা সভার চিড়া দেখিতে লাগিল ॥ ৭৭
 সকল কুণ্ডী-হোলনার চিড়া একেক গ্রাস ।
 মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস ॥ ৭৮
 হাসি মহাপ্রভু আর একগ্রাস লঞা ।
 তার মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া । ৭৯
 এইমত নিত্যানন্দ বেড়ায় সকল মণ্ডলে ।
 দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে ॥ ৮০
 কি করিয়া বেড়ায়, ইহা কেহো নাহি জানে ।
 মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে ॥ ৮১
 তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিল ।
 চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া ডাহিনে রাখিল ॥ ৮২
 আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাহাঁ বসাইল ।

দুইভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিল ॥ ৮৩
 দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈল ।
 কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিল ॥ ৮৪
 আজ্ঞা দিল—‘হরি’ বলি করহ ভোজন ।
 ‘হরি’-‘হরি’-ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন ॥ ৮৫
 ‘হরি হরি’ বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন ।
 পুলিন-ভোজন সভার হইল স্মরণ ॥ ৮৬
 নিত্যানন্দ প্রভু মহা-কৃপালু উদার ।
 রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার ॥ ৮৭
 নিত্যানন্দ প্রভাব কৃপা জানিবে কোন্ জন ।
 মহাপ্রভু আনি করায় পুলিনভোজন ॥ ৮৮
 শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাধিষ্ট হৈল ।
 গঙ্গাতীরে ‘যমুনা-পুলিন’ জ্ঞান কৈল ॥ ৮৯
 ‘মহোৎসব’ শুনি পসারি গ্রাম-গ্রাম হৈতে ।
 চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী গীতা ।

৭৬ । ধ্যানে তবে ইত্যাদি—সমস্তের পরিবেশন শেষ হইয়া গেলে শ্রীনিতাই-চাঁদ মহাপ্রভুর ধ্যান করিলেন, আর অমনি মহাপ্রভু সেই স্থানে আবিভূত হইলেন । অবশ্য সকলে মহাপ্রভুকে দেখিতে পায় নাই ।

৮১ । কি করিয়া বেড়ায় ইত্যাদি—সকলে দেখিতেছে, শ্রীনিতাইচাঁদ সকল মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ; তাঁহার সঙ্গে যে মহাপ্রভু ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, প্রত্যেক মালসা হইতে এক এক গ্রাস চিড়া লইয়া তাঁহার যা পরস্পরের মুখে দিতেছেন, এসব সকলে দেখিতে পায় নাই ; কোনও কোনও ভাগ্যবান্ মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন ।

৮২ । আরোয়া চিড়া—যে চিড়া হইতে ইতঃ-পূর্বে এক এক গ্রাস প্রভুস্বয় পরস্পরের মুখে দেন নাই, সেই চিড়া ।

৮৪ । এই পরারের স্থলে এইরূপ পাঠান্তর আছে :—“মহাপ্রভুর মনে বড় উল্লাস হইল । দেখি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দ বাড়িল ॥”

৮৬ । পুলিন-ভোজন ইত্যাদি—সকলের মনেই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পুলিন-ভোজনের কথা উদিত হইল ।

৮৭ । মহাকৃপালু—অত্যন্ত দয়ালু ; রঘুনাথের সামগ্রী অঙ্গীকার করায় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এই উৎসবে আনয়ন করায় শ্রীনিতাইচাঁদের দয়ার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । উদার—মহা উদার ; অত্যন্ত দাতা । এই উৎসব-উপলক্ষে শ্রীনিতাইচাঁদ কৃপা করিয়া রঘুনাথকে শ্রীচৈতন্য-চরণ-দান করিলেন ; ইহাতেই তাঁহার উদারতা প্রকাশ পাইতেছে ।

৮৯ । শ্রীরামদাসাদি ভক্তগণ এই চিড়া-মহোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ-সখা-গোপগণের ভাবে আবিষ্ট হইলেন ; নিজেরিগকে গোপ এবং গঙ্গাতীরকে যমুনা-পুলিন বলিয়া তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল ।

যত দ্রব্য লঞা আইসে, সব মূল্যে লয় ।
 তারি দ্রব্য মূল্যে লঞা তাহারে খাওয়ায় ॥ ৯১
 কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন ।
 সেহো চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ ॥ ৯২
 ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল ।
 চারি কুণ্ডী অবশেষ রঘুনাথে দিল ॥ ৯৩
 আর তিন কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল ।
 গ্রাসগ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥ ৯৪
 পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু-আগে দিল ।
 চন্দন আনিঞা প্রভুর সর্ববাস্ত্বে লেপিল ॥ ৯৫
 সেবকে তাম্বুল লঞা করে সমর্পণ ।
 হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্বণ ॥ ৯৬
 মালা চন্দন তাম্বুল শেষ যে আছিল ।
 শ্রীহস্তে প্রভু তাহা সভারে বাঁটি দিল ॥ ৯৭
 আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা ।
 আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া ॥ ৯৮
 এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার ।

‘চিড়াদধি-মহোৎসব’ খ্যাতি হৈল যার ॥ ৯৯
 ‘প্রভু বিশ্রাম কৈল, যদি দিন শেষ হৈল ।
 রাঘব-মন্দিরে প্রভু কীর্তন আরম্ভিল ॥ ১০০
 ভক্তসব নাচাইয়া নিত্যানন্দরায় ।
 শেষে নৃত্য করে—প্রেমে জগৎ ভাসায় ॥ ১০১
 মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন ।
 সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অণু জন ॥ ১০২
 নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্তন ।
 উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন ॥ ১০৩
 নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে ? ।
 মহাপ্রভু আইসে যেই নৃত্য দেখিবারে ॥ ১০৪
 নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল ।
 ভোজনের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল ॥ ১০৫
 ভোজনে বসিলা প্রভু নিজ-গণ লঞা ।
 মহাপ্রভুর আসন দিল ডাহিনে পাতিয়া ॥ ১০৬
 মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা ।
 দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাঢ়িলা ॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

৯১ । মূল্যে লয়—মূল্য দিয়া ক্রয় করে । মূল্যে লঞা—মূল্য দিয়া কিনিয়া । তাহারে—দোকানদারকে (পসারিকে) ।

৯৩ । চারিকুণ্ডী অবশেষ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ চারিকুণ্ডী । কুণ্ডী অর্থ এখানে মাটির বড় গামলা । পূর্ববর্তী ৮২ পয়ার দ্রষ্টব্য ।

৯৬ । তাম্বুল—পান ।

৯৮ । প্রভুর শেষ—প্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ । আপনার গণ ইত্যাদি—রঘুনাথ নিজ সঙ্গীয় লোকের সহিত প্রভুর ভুক্তাবশেষ ভাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন ।

১০২ । কীর্তনের সময় মহাপ্রভুও রাঘবের গৃহে আবির্ভূত হইয়া শ্রীনিতাইচাঁদের নৃত্য দেখিতেছিলেন ; কিন্তু শ্রীনিতাইচাঁদ ব্যতীত অপর কেহই মহাপ্রভুকে দেখিতে পায় নাই ।

১০৩ । শ্রীনিত্যানন্দের নৃত্যের মাধুর্যের সহিত উপমা দেওয়ার বস্তু ত্রিজগতে নাই ; তাঁহার নৃত্যের উপমা তাঁহারই নৃত্য ; অণু উপমা নাই ।

উপমা—তুলনা ।

১০৫ । পণ্ডিত—রাঘব পণ্ডিত । নিবেদন কৈল—ভোজন-গৃহে যাওয়ার নিমিত্ত শ্রীনিতাইচাঁদকে নিবেদন করিলেন ।

১০৭ । ভোজন-সময়েও আবির্ভাবে মহাপ্রভু আসিয়া শ্রীনিতাইচাঁদের ডাহিনদিকের আসনে বসিলেন ; রাঘব-পণ্ডিত তাঁহার দর্শন পাইলেন ।

দুই ভাই-আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা ।
 সকল বৈষ্ণবেরে পাছে পরিবেশন কৈলা ॥ ১০৮
 নানাপ্রকার পিঠা পায়স দিব্য শাল্যন্ন ।
 অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০৯
 রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ—অমৃতের সার ।
 মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বারবার ॥ ১১০
 পাক করি রাঘব ঘবে ভোগ লাগায় ।

মহাপ্রভু-লাগি ভোগ পৃথক্ বাঢ়ায় ॥ ১১১
 প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন ।
 মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন ॥ ১১২
 দুই ভাইকে আনিয়া রাঘব পরিবেশে ।
 যত্ন করি সব খাওয়ায় না রহে অবশেষে ॥ ১১৩
 কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি ।
 রাঘবের ঘরে রাঞ্জে রাধাঠাকুরাণী ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১০৮ । দুইভাই-আগে—শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাতে ।

১১০ । রাঘবের ঠাকুরের—রাঘব-পণ্ডিতের সেবিত ঠাকুরের (শ্রীরাধারমণের) । অমৃতের সার—অত্যন্ত সুস্বাদু । শ্রীরাধালাগি আবির্ভাবে রাঘবের গৃহে শ্রীরাধারমণের নিমিত্ত পাক করেন বলিয়া প্রসাদ অত্যন্ত সুস্বাদু হয় । পরবর্তী ১১৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । আইসে বার বার—মহাপ্রভু আবির্ভাবে আসিয়া প্রত্যহই রাঘব-পণ্ডিতের গৃহে ভোজন করেন । শচীমাতার রন্ধনে, নিত্যানন্দের নর্ত্তনে, শ্রীবাসের অঙ্গনে এবং রাঘবের ভবনে এই চারিস্থানে প্রভুর নিত্য আবির্ভাব ।

১১১ । পাক করি ইত্যাদি পয়ারে রাঘব-পণ্ডিতের প্রতিদিনের নিয়মিত-আচরণের কথা বলিতেছেন ।

১১২ । প্রত্যহই মহাপ্রভু রাঘবের গৃহে আবির্ভাবে আসিয়া ভোজন করেন ; কিন্তু রাঘব প্রতিদিন প্রভুর দর্শন পায়েন না, কোনও কোনও দিন পায়েন ।

১১৩ । দুই ভাইকে ইত্যাদি পয়ারে আবার (চিড়ামহোৎসবের) রাত্রির কথা বলিতেছেন । পূর্ববর্তী তিন পয়ারে তাঁহার অষ্টদিনের সাধারণ রীতির কথা বলিয়াছেন ।

১১৪ । রাঘবের ঘরে ইত্যাদি—রাঘব-পণ্ডিতের সেবিত শ্রীশ্রীরাধারমণের ভোগের পাক শ্রীশ্রীরাধালাগি অধ্যক্ষতায়ই সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

দুর্দাসা-ঋষি শ্রীশ্রীরাধালাগিকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, তিনি যাহা পাক করিবেন, তাহা অমৃত অপেক্ষাও সুস্বাদু হইবে এবং যিনি তাহা আহার করিবেন, তিনি দীর্ঘায়ুঃ হইবেন । এজন্ত বঙ্গলীলায় পুত্রবৎসলা যশোদামাতা প্রত্যহই শ্রীশ্রীরাধালাগি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আহাৰ্য্য প্রস্তুত করাইতেন । শ্রীকৃষ্ণও প্রেয়সী-শিরোমণি রাধালাগির পাচিত অন্নাদি ভোজন করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলভ করিতেন । তাই রসিক-ভক্তমণ্ডলীও তাঁহাদের প্রাণকোটপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীশ্রীরাধালাগির পাচিত অন্নাদি নিবেদন করিবার সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন । কিন্তু সাধক-ভক্তের গৃহে সাক্ষাৎ-ভাবে প্রকটিত হইয়া শ্রীরাধালাগি যে রন্ধন-কার্য্য সমাধা করিবেন, ইহা সম্ভব নহে । যাহারা ভোগ রন্ধন করেন, তাঁহারা রন্ধন-সময়ে শ্রীশ্রীরাধালাগির চরণে প্রার্থনা করেন, তিনি যেন তাঁহার প্রাণবল্লভের ভোগের পাকে কৃপা করিয়া অধ্যক্ষতা করেন, আর তাঁহাদিগকে যেন ঐ রন্ধনের আনুকূল্যার্থ নিয়োজিত করেন । রন্ধনের সময় তাঁহারা মনে করেন, শ্রীরাধালাগিই রন্ধন করিতেছেন, আর তাঁহারই ইচ্ছিতে তাঁহারা রন্ধনের আনুকূল্য করিতেছেন মাত্র । রাঘব-পণ্ডিতের গৃহে যাহারা ভোগ-রন্ধন করিতেন, তাঁহারাও ঐরূপই করিতেন, এবং তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎকর্ষার ফলে, শ্রীশ্রীরাধালাগিও কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে রন্ধনের শক্তি দিতেন, তাঁহার শক্তিতে, তাঁহার অধ্যক্ষতাতেই তাঁহারা ভোগ-রন্ধন করিতেন ।

যাহারা রাগাঙ্গুণীয়-মার্গে মধুর-ভাবের উপাসক, রন্ধন তাঁহাদের ভজনের একটি বিশেষ অঙ্গরূপে পরিণত হইতে পারে । রন্ধনের প্রারম্ভেই তাঁহারা প্রার্থনা করেন “রাধালাগি, তুমিই তোমার প্রাণবল্লভের নিমিত্ত রান্না

দুর্বাসার ঠাঞি তেঁহো পাইয়াছেন বরে ।

অমৃত হইতে তাঁর পাক অধিক মধুরে ॥ ১১৫

সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ—মাধুর্য্যের সার ।

দুই ভাই তাহা খাঞা আনন্দ অপার ॥ ১১৬

ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্বজন ।

পণ্ডিত কহে পাছে ইঁহ করিবে ভোজন ॥ ১১৭

ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন ।

হরিশ্রবণি করি উঠি কৈল আচমন ॥ ১১৮

ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন ।

রাঘব আনি পরাইল মাল্য-চন্দন ॥ ১১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

করিয়া থাক ; তোমার পাচিত দ্রব্যাদিতেই তোমার প্রাণবল্লভ অত্যন্ত প্রীতলাভ করিয়া থাকেন । আমরা নিতান্ত অধম, আমাদের এমন কোনও যোগ্যতা নাই, যাহাতে আমরা তোমার প্রাণবল্লভের ভোগের নিমিত্ত রন্ধন করিতে পারি । প্রাণেশ্বর, কৃপা করিয়া তুমিই তোমার প্রাণবল্লভের নিমিত্ত রন্ধন কর, আর কৃপা করিয়া, আমাদেরকে তোমার অল্পগতা দাসী মনে করিয়া রন্ধনের সহায়তায় নিযুক্ত কর ।” এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা মনে করেন, স্বয়ং রাধারাগী আসিয়াই রন্ধনগৃহে বসিয়াছেন, আর তাঁহাদিগকে রন্ধনের আনুকূল্যার্থ নানাবিধ আদেশ করিতেছেন । তাঁহার কৃপাদেশ পাইয়াই যেন তাঁহারা সব কাজ করিতেছেন,—চুলায় আগুন ধরাইতেছেন, তরকারী প্রস্তুত করিতেছেন, চুলায় হাঁড়ি বসাইতেছেন, তাহাতে চাউল, তরকারী-আদি দিতেছেন, জল আনিতেছেন, ইত্যাদি । যখন যে কাজ করার প্রয়োজন হয়, মনে মনে শ্রীরাধারাগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার আদেশ লইয়াই যেন সে কাজ করিতেছেন । নিজের অন্তর্নিহিত সিদ্ধদেহে এ সব কাজ করিতেছেন মনে করিতে পারিলে ভক্তের বিশেষ আনুকূল্য হয় ।

কেবল রন্ধন কেন, জীলোকের প্রায় সমুদয় গৃহকর্মই এইরূপে শ্রীশ্রীরাধারাগীর দাসী-অভিনানে, তাঁহারই ইচ্ছিতে করা হইতেছে বলিয়া জীলোকভক্ত মনে করিতে পারেন । পুরুষ ভক্তের কোনও কোনও বিষয়-কর্মও সম্ভবতঃ এইরূপ অভিনানে করা যাইতে পারে । ইহা করিতে পারিলে গৃহকর্মের অমুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেও ভজন চলিতে পারে ।

১১৫ । দুর্বাসার ঠাঞি—দুর্বাসা ঋষির নিকট । তেঁহো—শ্রীরাধাঠাকুরাণী । বরে—বর । “রাঘবের ঠাকুরের” হইতে “তাঁর পাক অধিক মধুর” পর্য্যন্ত ১১০-১৫ পয়ারে রাঘব-পণ্ডিতের বাড়ীর প্রসাদের নাহাওয়া বলিয়াছেন ।

বস্তুতঃ শ্রীশ্রীরাধারাগীকে বর দেওয়ার যোগ্যতা বা অধিকার দুর্বাসা-ঋষির নাই, থাকিতেও পারেনা । ইহা লীলাশক্তিরই এক চাতুর্য্যভঙ্গী—বরের অভিনয়মাত্র । এই বরের ছলেই শ্রীশ্রীযশোদামাতা প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান রান্না করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীরাধারাগীকে প্রত্যহ যাবট হইতে নন্দালয়ে নেওয়াইতে পারিয়াছিলেন । এই বর না থাকিলে প্রত্যহ পরবধূকে আনাইয়া রান্না করান সম্ভব হইত না (প্রকট ব্রজলীলায় যোগনায়ায় প্রভাবে ব্রজবাসীরা শ্রীরাধারাগীকে পরবধূ বলিয়াই মনে করিতেন) । ইহাতেই শ্রীরাধার পক্ষে তাঁহার প্রাণবল্লভের জ্ঞান আহাৰ্য্য-প্রস্তুত করার এবং তদুপলক্ষ্যে পূর্বাঙ্কে নন্দালয়ে প্রাণবল্লভের সংক্ষিপ্ত দর্শনাদিরও সুযোগ ঘটয়াছে । এই সুযোগ সৃষ্টির জন্মই লীলাশক্তি দুর্বাসার যোগে বরদানের অভিনয় করাইয়াছেন । পূর্ববর্তী ১১৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১১৬ । পূর্বোক্ত “অমৃত নিন্দয়ে” ইত্যাদি ১০৯ পয়ারের সহিত এই পয়ারের অর্থ করিতে হইবে । রাঘব শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাতে নানাবিধ সুগন্ধি, সুন্দর ও সুস্বাদ প্রসাদ আনিয়া রাখিলেন ; তাঁহারা উভয়ে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ।

দুই ভাই—দুই প্রভু ।

১১৭ । ভোজন করিবার নিমিত্ত রঘুনাথদাসকেও সকল বৈষ্ণব অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু পরম-কৃপালু রাঘব-পণ্ডিত বলিলেন—“না, রঘুনাথ এখন বসিবে না ; পরে প্রসাদ পাইবে ।” প্রভুদ্বয়ের ভোজনের পরে তাঁহাদের অবশেষ গ্রহণ করিয়া তারপর রঘুনাথ প্রসাদ পাইবেন, ইহাই পণ্ডিতের অভিপ্রায় ।

ইঁহ—রঘুনাথ ।

বিড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন ।
 ভক্তগণে বিড়া দিল মাল্য-চন্দন ॥ ১২০
 রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথের উপরে ।
 ছই-ভাইয়ের অবশিষ্ট-পাত্র দিল তারে ॥ ১২১
 কহিল—চৈতন্যগোসাঞি করিয়াছেন ভোজন ।
 তাঁর শেষ পাইলে, তোমার খণ্ডিল বন্ধন ॥ ১২২
 ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে সদা অবস্থান ।

কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥ ১২৩
 সর্বত্র ব্যাপক প্রভু সদা সর্বত্র বাস ।
 ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ ॥ ১২৪
 প্রাতে নিত্যানন্দপ্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া ।
 সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজ-গণ লঞা ॥ ১২৫
 রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন ।
 রাঘবপণ্ডিতদ্বারে কৈল নিবেদন ॥ ১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

১২০। বিড়া—পান ।

১২১। ছই ভাইয়ের অবশিষ্ট—ছই প্রভুর ভুক্তাবশেষ ।

১২২। তার শেষ ইত্যাদি—রাঘব-পণ্ডিত রঘুনাথকে বলিলেন, “শ্রীচৈতন্যগোসাঞি এখানে ভোজন করিয়াছেন, তুমি তাঁহার ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়াছ, ইহাতেই তোমার সমস্ত সংসার-বন্ধন যুচিয়া গেল ।”

১২৩। শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন নীলাচলে ছিলেন; কিন্তু কিরূপে তিনি রাঘবের গৃহে ভোজন করিলেন? এই আশঙ্কা-নিরসনের নিমিত্ত বলিতেছেন “ভক্ত-চিত্তে” ইত্যাদি ।

পরব্রহ্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুতে অগুহ ও বিভূত যুগপৎ বর্তমান । তাঁহার দেহখানি—যাহাকে মাছুষের দেহের মত পরিচ্ছিন্ন, গীমাবদ্ধ বলিয়াই মনে হয়, তাহাই—সর্বগ, অনন্ত, বিত্ব । যেই সময়ে এবং যেই দেহে তিনি নীলাচলে সকলের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, ঠিক সেই সময়ে এবং ঠিক সেই দেহেই তিনি সর্বব্যাপক । বাস্তবিক বিভূবস্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বদাই সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেন; তবে লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না । তিনি কৃপা করিয়া যখন যাহাকে দর্শন দেন, তখনই সে তাঁহাকে দেখিতে পারে । একটলীলা-সময়ে তিনি কৃপা করিয়া সকলকে দর্শন দেন এবং তাঁহার লীলা নরলীলা বলিয়া তাঁহার আচরণের সঙ্গে মাছুষের আচরণের কতকটা সাদৃশ্য থাকে । তাই তিনি মাছুষের মত হাটিয়া নবদীপ হইতে নীলাচলে গেলেন, নীলাচলে অবস্থান করিলেন । সাধারণ লোক মনে করিল, তিনি নীলাচলেই আছেন, অস্ত্র নাই । কিন্তু তাহা নহে; তখনও তিনি সর্বত্র আছেন, স্মৃতাং রাঘবের গৃহেও আছেন, কখনও গুপ্ত কখনও ব্যক্ত । কেহ কেহ কখনও কখনও তাঁহারই কৃপায় তাঁহাকে দেখিতে পায় । রাঘবের গৃহে ভোজন-সময়ে রাঘবও তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন ।

ভক্তচিত্তে ইত্যাদি—তিনি বিভূবস্ত বলিয়া সর্বদা সর্বত্র বর্তমান থাকিলেও ভক্তচিত্তে ও ভক্ত-গৃহে তাঁহার অবস্থানের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করার হেতু বোধ হয় এই যে, ভক্তির প্রভাবে, ভক্তের চিত্তে এবং ভক্তের গৃহেই তাঁহার কৃপা বিশেষরূপে ভক্তকর্তৃক অনুভূত হইয়া থাকে । “ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সত্যত বিশ্রাম । ১।১।৩০ ॥” ১।১।২৫-শ্লোকের টীকার শেষ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ।

স্বতন্ত্র ভগবান্—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের দ্বারাই নিজে নিয়ন্ত্রিত হইলেন । তিনি কেন যে “কভু গুপ্ত” এবং “কভু ব্যক্ত” হইলেন, তাহার হেতু বলিতেছেন, তিনি “স্বতন্ত্র ভগবান্”—তাঁহার ইচ্ছাই ইহার একমাত্র হেতু ।

১২৪। সর্বত্র ব্যাপক—তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন । সদা সর্বত্র বাস—সকল সময়েই তিনি সকল স্থানে বর্তমান আছেন; যেহেতু তিনি বিভূবস্ত । পূর্ববর্তী ১২৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১২৫। প্রাতে—রাঘবের বাড়ীর উৎসবের (অথবা চিড়া-মহোৎসবের) পরের দিন প্রাতঃকালে । সেই বৃক্ষ মূলে—যে বৃক্ষমূলে পূর্বদিন চিড়া-মহোৎসব হইয়াছিল ।

১২৬। রঘুনাথ এখন বুঝিতে পারিয়াছেন—শ্রীনিতাইয়ের কৃপা হয় নাই বলিয়াই পুনঃ পুনঃ চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে উপনীত হইতে পারেন নাই । তাই এক্ষণে শ্রীনিতাইয়ের কৃপা ও আশীর্বাদ

অধম পামর মুঞি হীন জীবধম ।
 মোর ইচ্ছা হয়ে—পাণ্ডু চৈতন্যচরণ ॥ ১২৭
 বামন হঞা যেন চান্দ ধরিবারে চায় ।
 অনেক যত্ন কৈলু ঘাইতে, কভু সিদ্ধ নয় ॥ ১২৮
 যতবার পালাও, আমি গৃহাদি ছাড়িয়া ।
 পিতা-মাতা দুইজনা রাখয়ে বান্ধিয়া ॥ ১২৯
 তোমার কৃপা বিনে কেহো চৈতন্য না পায় ।
 তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেহো পায় ॥ ১৩০
 অযোগ্য মুঞি, নিবেদন করিতে করোঁ ভয় ।
 মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি! হইয়া সদয় ॥ ১৩১
 মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ ।
 ‘নির্বিরলে চৈতন্য পাণ্ডু’ কর আশীর্বাদ ॥ ১৩২
 শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে—
 ইঁহার বিষয়সুখ ইন্দ্রসুখসমে ॥ ১৩৩

চৈতন্যকৃপাতে সেহো নাহি ভায় মনে ।
 মতে আশীষ দেহ—পায় চৈতন্য-চরণে ॥ ১৩৪
 কৃষ্ণপাদপদ্মগন্ধ যেইজন পায় ।
 ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তারে নাহি ভায় ॥ ১৩৫

তথাহি (ভাঃ ৫।১৪।৪৩)—

যো দুস্ত্যজান্দারমুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিষ্পৃশঃ ।
 জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃ শ্লোকলালসঃ ॥

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা ।
 তার মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা— ॥ ১৩৬
 তুমি যে করাইলে এই পুলিন ভোজন ।
 তোমায় কৃপা করি চৈতন্য কৈলা আগমন ॥ ১৩৭
 কৃপা করি কৈল দুগ্ধ-চিপীট ভক্ষণ ।
 নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

প্রার্থনা করিতেছেন । কিন্তু ভক্তি হইতে উখিত দৈন্তবশতঃ তিনি মনে করিলেন, নিতাইটাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করার যোগ্যতাও তাঁহার নাই; তাই তিনি শ্রীপাদ রাঘব পণ্ডিতের নিকটে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারই কথা শ্রীনিতাইটাদের চরণে নিবেদন করার জন্ত অমুরোধ করিলেন । অভিপ্রায় এই—শ্রীল রাঘবপণ্ডিতের প্রতি শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের অসাধারণ কৃপা; তিনি যদি আমার মত অযোগ্য পামরের জন্ত শ্রীনিতাইয়ের চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, আমার প্রতি প্রভুর কৃপা হইতে পারে ।

পরবর্তী ১২৭-১৩২ পয়ারে রঘুনাথের কথাই শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের মুখে প্রকাশিত হইয়াছে ।

১৩৩। “ইঁহার বিষয়-সুখ” হইতে “তারে নাহি ভায় ।” পর্য্যন্ত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর উক্তি ।

ইঁহার—রঘুনাথের ।

১৩৪। নাহি ভায়—ভাল লাগেনা । আশীষ—আশীর্বাদ ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ নিজেও রঘুনাথের প্রতি কৃপা করিলেন এবং উপস্থিত বৈষ্ণবগণকেও বলিলেন, যেন তাঁহারও রঘুনাথকে কৃপা করেন—যাহাতে রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ পাইতে পারেন । বৈষ্ণবগণের নিকটে রঘুনাথের জন্ত আশীর্বাদ চাওয়াতেই তাঁহার প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা স্ফুট হইতেছে ।

১৩৫। ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মাণ্ড সত্যলোক । ব্রহ্মলোক আদি-সুখ—ব্রহ্মলোকাদিতে উপভোগ্য সুখ । তারে নাহি ভায়—তাঁহার চিন্তকে আকর্ষণ করে না । ইহলোকে জীপুত্রাদির সঙ্গ-সুখের কথা তো অতি তুচ্ছ ।

শ্লো। ২। অম্বয় । অম্বয়াদি ২২৩।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে ঘাঁহাদের রতি জন্মিয়াছে, ধন-সম্পদ-স্ত্রী-পুত্রাদি যে তাঁহাদের চিন্তকে আকৃষ্ট করিতে পারেনা, তাঁহারই প্রমাণ এই শ্লোক; এইরূপে ইহা ১৩৫ পয়ারের প্রমাণ ।

১৩৭। রঘুনাথের প্রতি যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হইয়াছে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ তাহাই তাঁহাকে জানাইতেছেন ।

১৩৮। দুগ্ধ-চিপীট—দুগ্ধ চিড়া । নৃত্য দেখি—রাঘবের গৃহে রাত্রিতে নৃত্যকীর্তনাদি দেখিয়া । প্রসাদ-ভোজন—রাঘবের গৃহে রাত্রিতে প্রসাদ-ভক্ষণ ।

তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইল আপনে ।
 ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ॥ ১৩৯
 স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে ।
 ‘অন্তরঙ্গ ভৃত্য’ করি রাখিবেন চরণে ॥ ১৪০
 নিশ্চিত হইয়া যাহ আপন ভবনে ।
 অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণে ॥ ১৪১
 সব ভক্তগণে তাঁরে আশীর্বাদ করাইল ।
 তাঁ’ সভার চরণ রঘুনাথ বন্দিল ॥ ১৪২
 প্রভুর আজ্ঞা লৈয়া বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল ।
 রাঘব-সহিতে নিভূতে যুক্তি করিল ॥ ১৪৩
 যুক্তি করি শতমুদ্রা সোনা তোলা-সাত ।
 নিভূতে দিল প্রভুর ভাণ্ডারীর হাথ ॥ ১৪৪
 তারে নিষেধিল—প্রভুকে এবে না কহিবা ।
 নিজঘরে যাবে থবে, তবে নিবেদিবা ॥ ১৪৫
 তবে রাঘবপণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেল ।
 ঠাকুর দর্শন করাইয়া মালা-চন্দন দিলা ॥ ১৪৬
 অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে ।

তবে পুনঃ রঘুনাথ কহে পণ্ডিতেরে— ॥ ১৪৭
 প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ভৃত্যশ্রিত জন ।
 পূজিতে চাহিয়ে আমি সভার চরণ ॥ ১৪৮
 বিশ পঞ্চদশ বার দশ পঞ্চ হয় ।
 মুদ্রা দেহ বিচারি যার যত যোগ্য হয় ॥ ১৪৯
 সব লেখা করিয়া রাঘব-পাশ দিলা ।
 যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা ॥ ১৫০
 একশত মুদ্রা আর সোনা তোলাদ্রয় ।
 পণ্ডিতের আগে দিল করিয়া বিনয় ॥ ১৫১
 তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা ।
 নিত্যানন্দকৃপায় আপনাকে ‘কৃতার্থ’ মানিলা ॥ ১৫২
 সেই হৈতে অভ্যন্তর না করে গমন ।
 বাহিরে দুর্গামণ্ডপে যাঞা করেন শয়ন ॥ ১৫৩
 তাহাঁ জাগি রহে সব রক্ষকের গণ ।
 পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন ॥ ১৫৪
 হেনকালে গোড়ের সব গৌরভক্তগণ ।
 প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৩৯। উদ্ধারিতে—সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করিতে । বিঘ্নাদি-বন্ধনে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে যাওয়ার প্রতিকূলে যতরকম বাধাবিঘ্ন আছে, তৎসমস্ত (প্রভুর কৃপায় দূরীভূত হইল ; এখন তুমি স্বচ্ছন্দে প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে যাইতে পারিবে) ।

১৪০। স্বরূপের স্থানে—স্বরূপ-দামোদরের তত্ত্বাবধানে । মহাপ্রভু রঘুনাথদাসের নিমিত্ত কি বন্দোবস্ত করিবেন, শ্রীনিতাইচাঁদ এখনই তাহা জানাইয়া দিতেছেন । প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রভু কি করিবেন, তাহা শ্রীনিতাই পূর্বে হইতে কিরূপে জানিলেন ? ইহা জানা শ্রীনিতাইয়ের পক্ষে অসম্ভব নহে, কারণ নিতাই-চৈতন্যে কোনও ভেদ নাই, তাঁহারা একই, দুইভাগে প্রকট হইয়াছেন মাত্র ।

১৪৪। রাঘব পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিয়া রঘুনাথদাস, শ্রীমন্নিত্যানন্দের সেবার নিমিত্ত, প্রভুর ভাণ্ডারীর নিকটে অতি গোপনে একশত টাকা এবং সাত তোলা সোনা দিলেন ।

নিভূতে—গোপনে ; প্রভু যেন এখন জানিতে না পারেন, এই ভাবে ; প্রভু জানিতে পারিলে হয়তো গ্রহণ করিতে অসম্মত হইবেন ।

১৪৬। ঠাকুরদর্শন—রাঘবের সেবিত শ্রীরাধারমণের দর্শন ।

১৪৮। ভৃত্যশ্রিত জন—ভৃত্য এবং আশ্রিত লোক । “মহাস্ত আর ভৃত্যগণ”-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ।

১৫০। চিঠি লেখাইল—ফর্দ করিলেন ।

১৫৩। অভ্যন্তর—বাড়ীর ভিতরে ; অন্তর-মহলে । দুর্গামণ্ডপ—দুর্গাপূজার মন্দির ।

তাঁ-সভার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে ।
 প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গে তবহিঁ ধরা পড়ে ॥ ১৫৬
 এইমত চিন্তিতেই দৈবে একদিনে ।
 বাহিরে দেবীমণ্ডপে করি আছেন শয়নে ॥ ১৫৭
 দণ্ডচারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ ।
 যত্ননন্দন আচার্য্য তবে করিলা প্রবেশ ॥ ১৫৮
 বাসুদেবদত্তের তেঁহো হয় অনুগৃহীত ।
 রঘুনাথের গুরু তেঁহো হয় পুরোহিত ॥ ১৫৯
 অদ্বৈত-আচার্য্যের তেঁহো শিষ্য অন্তরঙ্গ ।
 আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে—চৈতন্য প্রাণধন ॥ ১৬০
 অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো যবে দাণ্ডাইলা ।
 রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ১৬১
 তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে ।

সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে—॥ ১৬২
 রঘুনাথে কহে—তারে করহ সাধন ।
 সেবা যেম করে, আর নাহিক ব্রাহ্মণ ॥ ১৬৩
 এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা ।
 রক্ষক সব শেষরাত্রে নিদ্রায় পড়িলা ॥ ১৬৪
 আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব দিশাতে ।
 কহিতে-শুনিতে দৌহে চলে সেইপথে ॥ ১৬৫
 অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে—।
 আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাইব তোমাস্থানে ॥ ১৬৬
 তুমি স্থখে ঘর যাহ, মোরে আজ্ঞা হয় ।
 এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয়—॥ ১৬৭
 ‘সেবক রক্ষক আর কেহো নাহি সঙ্গে !
 পলাইতে আমার ভাল এই ত প্রসঙ্গে’ ॥ ১৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

১৫৬ । প্রসিদ্ধ প্রকট ইত্যাদি—গৌড়ের ভক্তগণ যে নীলাচলে যাইতেছেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে—সকলেই জানে; তাঁহারা কোন্ পথে যাইতেছেন তাহাও সকলে জানে; সুতরাং রঘুনাথ যদি তাঁহাদের সঙ্গে যাবেন, তবে সহজেই ধরা পড়িবার সম্ভাবনা ।

১৫৮ । চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে যত্ননন্দন আচার্য্য, রঘুনাথ যে দুর্গামণ্ডপে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দুর্গামণ্ডপের নিকটে আসিলেন ।

১৫৯ । যত্ননন্দন-আচার্য্যের পরিচয় দিতেছেন । যত্ননন্দন-আচার্য্য বাসুদেবদত্তের কৃপাপাত্র এবং রঘুনাথ-দামের দীক্ষাগুরু এবং পুরোহিতও বটেন ।

১৬০ । যত্ননন্দন-আচার্য্য শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য এবং অত্যন্ত অন্তরঙ্গ (অঙ্গত) ভক্ত ।

আচার্য্য আজ্ঞাতে—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের আদেশে যত্ননন্দন-আচার্য্য শ্রীমদ্রাহাপ্রভুকেই স্বীয় প্রাণসম্বলিয়া মনে করেন । যত্ননন্দন অদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতাবলম্বী ছিলেন; সুতরাং শ্রীঅদ্বৈতকর্তৃক পরিত্যক্ত নহেন, ইহা বলাই এই পয়ারাঙ্গের উদ্দেশ্য ।

১৬১ । অঙ্গনে—দুর্গামণ্ডপের অঙ্গনে । তেঁহো—যত্ননন্দন-আচার্য্য ।

১৬২ । তাঁর এক শিষ্য—যত্ননন্দনের এক ব্রাহ্মণ-শিষ্য ।

১৬৪ । রক্ষক সব ইত্যাদি—শেব রাত্রিতে রঘুনাথের রক্ষকেরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া রঘুনাথ যে যত্ননন্দনের সঙ্গে চলিয়া যাইতেছেন, ইহা কেহ টের পাইল না; সুতরাং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেও কেহ যাইতে পারিল না ।

১৬৫ । পূর্ব দিশাতে—রঘুনাথের গৃহ হইতে পূর্বদিকে ।

১৬৭ । মোরে আজ্ঞা হয়—রঘুনাথ তাঁহার গুরুদেবকে বলিলেন—“আপনি গৃহে যাউন; আমিই আপনার পূজারী-শিষ্যকে বলিয়া কহিয়া পাঠাইয়া দিব । আমাকে আদেশ করুন ।” যত্ননন্দন মনে করিলেন, পূজারী-শিষ্যকে সাধিবার নিমিত্ত রঘুনাথ একাকী যাওয়ার আদেশই প্রার্থনা করিতেছেন, তাই তিনিও আদেশ দিলেন এবং নিজে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী গীতা ।

গৃহে ফিরিয়া গেলেন । কিন্তু রঘুনাথ অস্ত্র উদ্দেশে গুরুদেবের আদেশ ভিক্ষা করিলেন—তিনি মনে মনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনার্থ নীলাচলে যাত্রা করার আদেশই প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; শ্রীচৈতন্যের কৃপা-ভঙ্গীতে যদুনন্দন রঘুনাথের মনের ভাব বুদ্ধিতে পারেন নাই ; তিনি আদেশ দিলেন । এই ছলে গুরুর আদেশ লইয়া রঘুনাথ নীলাচলে পলায়ন করিবার সঙ্কল্প করিলেন ।

শান্তিপু্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিয়া রঘুনাথ যখন গৃহত্যাগের সঙ্কল্প জানাইয়াছিলেন, তখন প্রভু বলিয়াছিলেন,—“এখন তুমি গৃহে যাও, অনাসক্ত হইয়া বিষয়-কর্ম কর । আমি যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিব, “তবে তুমি যোর পাশ আসিহ কোন ছলে । সে কালে সে ছল কৃষ্ণ ক্ষুরাবে তোমারে ॥ ২।১৬।২৩৮-৩৯ ॥” এফণে “কৃষ্ণ সেই ছল” ক্ষুরাইলেন । রঘুনাথকে উদ্ধার করার উদ্দেশে, যদুনন্দন আচার্যের পূজারীর চিতে সেবা ছাড়িয়া পলায়নের ইচ্ছা কৃষ্ণই ক্ষুরিত করিয়াছেন, শেষ রাত্রিতে রক্ষকগণকে কৃষ্ণই নিদ্রিত করাইয়াছেন, রঘুনাথের প্রার্থনায় পূজারীর অসুস্থকানে রঘুনাথকে একাকী পাঠাইয়া নিজে গৃহে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছাও যদুনন্দনের চিতে কৃষ্ণই ক্ষুরিত করিয়াছেন, রঘুনাথের যে পলায়নের সম্ভাবনা আছে, যদুনন্দনের মনে এমনদেহও কৃষ্ণই উদ্ভিত হইতে দেন নাই । সর্বশেষে ছলপূর্বক গুরুদেবের চরণে নীলাচল-যাত্রার আদেশ প্রার্থনার ইচ্ছাও রঘুনাথের চিতে কৃষ্ণই ক্ষুরিত করিয়াছেন এবং শেষ-রাত্রিতে রঘুনাথকে একাকী ছাড়িয়া দিলে তাঁহার যে পলায়নের সুযোগ এবং সম্ভাবনা হইবে, যদুনন্দনের মনে এইরূপ মনেদেহও কৃষ্ণই উদ্ভিত হইতে দেন নাই । রঘুনাথের পলায়নের অল্পকূল সমস্ত সুযোগই কৃষ্ণ উপস্থিত করিলেন । তাই বোধ হয় পূর্বেই শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথকে শান্তিপু্রে বলিয়াছিলেন—“কৃষ্ণ কৃপা যারে তারে কে রাখিতে পারে ? ২।১৬।২৩৯ ॥”

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই যে শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের আবির্ভাব, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহা লিখিয়াছেন—১।১৩।১৩ পর্যায়ে । যাহা হউক, অস্তালীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, হরিদাস-ঠাকুর বেণাপোল হইতে সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী চাঁদপুরে আসেন । তখন “রঘুনাথদাস বালক করে অধ্যয়ন । হরিদাস-ঠাকুরে যাই করে দরশন ॥ হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে । সেই কৃপা কারণ হৈল তাঁরে চৈতন্য পাইবারে ॥ ৩।৩।৬১-৬২ ॥” চাঁদপুর হইতে হরিদাস শান্তিপু্রে আসেন (৩।৩।২১) । শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য তাঁহার জঘ গঙ্গাতীরে একটা গোঁফা করিয়া দিলেন । শ্রীঅদ্বৈত “কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য প্রতিজ্ঞা করিল । জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল ॥ হরিদাস করে গোঁফায় নাম সঙ্কীর্্তন । কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে এই তাঁর মন ॥ দুইজনার ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার । নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার ॥ ৩।৩।২১-২৩ ॥” এই সমস্ত উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্বেই শ্রীল রঘুনাথদাসের আবির্ভাব । চব্বিশ বৎসর বয়সে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । সন্ন্যাসের পরে দাক্ষিণাত্য, গোড় এবং বৃন্দাবন ভ্রমণাদিতে প্রভুর ছয় বৎসর লাগিয়াছিল । সুতরাং প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন, তখন প্রকট লীলায় তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর । বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসার সংবাদ পাইয়াই রঘুনাথ প্রভুর নিকটে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছিলেন (৩।৬।১৫) ; ঠিক এই সময়ে তিনি স্নেহ উজ্জীর কর্তৃক বন্দী হইলেন (৩।৬।১৯) ; স্বীয় বুদ্ধি-চাতুর্যে তিনি মুক্তি পাইলেন । “এই মত রঘুনাথের বৎসরেক গেল । দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল ॥ ৩।৬।৩৪ ॥” বার বার পলাইয়া যায়েন ; কিন্তু পিতা-জ্যেষ্ঠা ধরিয়া আনেন । তার পরে “রঘুনাথ বিচারিলা মনে । নিত্যানন্দ গোস্বামীর পাশ চলিলা আর দিনে ॥ ৩।৬।৪১ ॥” পাণিহাটীতে শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরণ দর্শন করিয়া এবং চিড়া-মহোৎসব সম্পাদন করিয়া রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন । তাহার পরেই তিনি নীলাচলে যাত্রা করেন । যখন তিনি যাত্রা করেন, তখন সেন-শিবানন্দাদি গোড়ীয়-ভক্তগণও রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচল যাইতেছিলেন (৩।৬।১৫৫, ১৭৬-৮০) । ইহা হইতেছে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসার দুই বৎসর পরের রথযাত্রা । সুতরাং রঘুনাথ যখন নীলাচল যাত্রা করেন, তখন প্রকটলীলায় প্রভুর বয়স দ্বাত্রিশ বৎসর । কবিরাজ অচ্যুতও লিখিয়াছেন—রঘুনাথ স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে বোল বৎসর ব্যাপিয়া প্রভুর অন্তরঙ্গ

এত চিন্তি পূর্বমুখে করিল গমন ।
 উলটিয়া চাহে পাছে, নাহি কোন জন ॥ ১৬৯
 শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ চিন্তিয়া !
 পথ ছাড়ি উপপথে যানেন ধাইয়া ॥ ১৭০
 গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যায় বনে বনে ।
 কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্য-চরণে ॥ ১৭১
 পঞ্চদশকোশ চলি গেল একদিনে ।
 সন্ধ্যাকালে রহিল এক গোপের বাথানে ॥ ১৭২
 উপবাসী দেখি গোপ দুহু আনি দিল ।
 সেই দুহু পান করি পড়িয়া রহিল ॥ ১৭৩
 এথা তাঁর সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া ।
 তাঁর গুরু-পাশে বার্তা পুছিলেন গিয়া ॥ ১৭৪
 তেঁহো কহে—আজ্ঞা মাগি গেল নিজঘর ।
 ‘পলাইল রঘুনাথ’—উঠিল কোলাহল ॥ ১৭৫

তাঁর পিতা কহে—গোড়ের সব ভক্তগণ ।
 প্রভুস্থানে নীলাচলে করিয়াছে গমন ॥ ১৭৬
 সেইসঙ্গে রঘুনাথ গেল পলাইয়া ।
 দশজন যাহ, তারে আনহ ধরিয়া ॥ ১৭৭
 শিবানন্দে পত্নী দিল বিনয় করিয়া—
 আমার পুত্রেরে তুমি দিবে বাহুড়িয়া ॥ ১৭৮
 ঝাঁকরা-পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জন ।
 ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ ॥ ১৭৯
 পত্নী দিয়া শিবানন্দে বার্তা পুছিল ।
 শিবানন্দ কহে—তেঁহো ইহা না আইল ॥ ১৮০
 বাহুড়িয়া সেই দশ জন আইলা ঘর ।
 তাঁর মাতা-পিতা হৈল চিন্তিত-অন্তর ॥ ১৮১
 এথা রঘুনাথদাস প্রভাতে উঠিয়া ।
 পূর্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণমুখ হঞা ॥ ১৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

সেবা করিয়াছিলেন (১৫০১-১৫০২)—প্রভুর অন্তর্দানের সময় পর্য্যন্ত । আটচল্লিশ বৎসর বয়সে প্রভু লীলা সম্বরণ করেন । ৪৮ হইতে ১৬ বাদ দিলে থাকে ৩২ । ইহা হইতেও জানা যায়, প্রভুর ৩২ বৎসর বয়সের সময়েই রঘুনাথ তাঁহার চরণে মিলিত হইয়াছিলেন । প্রভুর আবির্ভাবের জ্ঞাত শ্রীঅদ্বৈতের এবং শ্রীহরিদাসের আরাধনার পূর্বেই যখন রঘুনাথ অধ্যয়নে ব্যাপ্ত ছিলেন, তখন ইহাই মনে হয় যে, তিনি যেন প্রভুর আবির্ভাবের অন্ততঃ আট দশ বৎসর পূর্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন । তাহা হইলে রঘুনাথ যখন নীলাচল যাত্রা করেন, তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয় । প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে ১৪০৭ শকে ; তাহা হইল আনুমানিক ১৩৯৭-৯৮ শকেই রঘুনাথদাসের আবির্ভাব হইয়া থাকিবে । কবিরাজ গোস্বামীর উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ অনুমান করা হইল ।

১৭০ । পথ ছাড়ি উপপথে ইত্যাদি—তাঁহার পলায়নের সন্দেহ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে লোক বাহির হইতে পারে ; প্রসিদ্ধ পথে গেলে তাহাদের হাতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা ; তাই রঘুনাথ পথ ছাড়িয়া উপপথে—অপ্রসিদ্ধ ছোট পথে দ্রুতবেগে গমন করিলেন ।

১৭২ । গোপের বাথান—গোয়ালদিগের গরু রাখিবার স্থান ।

১৭৪ । গুরু-পাশে—যত্ননন্দন-আচার্য্যের নিকটে ।

১৭৮ । শিবানন্দে পত্নী দিল—গোড়-দেশ হইতে যেসকল ভক্ত নীলাচলে যাইতেন, শিবানন্দসেনই অধ্যক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন । এজন্য শিবানন্দের নিকটেই পত্র দেওয়া হইল । দিবে বাহুড়িয়া—ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিবে ।

১৮২ । প্রথম দিন রঘুনাথ সপ্তগ্রাম হইতে পূর্ব-দিকে পনের কোশ পর্য্যন্ত চলিয়াছিলেন । পরের দিন প্রাতঃকালে ঐস্থান হইতে (বাথান হইতে) দক্ষিণদিকে রওনা হইলেন । ধরা পড়ার আশঙ্কাতেই প্রথম হইতে দক্ষিণ দিকে না যাইয়া পূর্বদিকে গিয়াছিলেন ।

ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরান ।
কুগ্রাম দিয়া-দিয়া করিল প্রয়াণ ॥ ১৮৩
ভক্ষণাপেক্ষা নাহি, সমস্ত দিবস গমন ।
ক্ষুধা নাহি বাধে চৈতন্য-চরণ-প্রাপ্ত্যে মন ॥ ১৮৪
কভু চর্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধ-পান ।
যবে যেই মিলে, তাতে রাখে নিজপ্রাণ ॥ ১৮৫
বারোদিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম ।
পথে তিনদিনমাত্র করিল ভোজন ॥ ১৮৬
স্বরূপাদিসহ গোসাঞি আছেন বসিয়া ।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিল আসিয়া ॥ ১৮৭
অঙ্গনে দূরে রহি করেন প্রণিপাত ।
মুকুন্দদত্ত কহে—এই আইলা রঘুনাথ ॥ ১৮৮
প্রভু কহে—‘আইস’ তৈহো ধরিল চরণ ।

উঠি প্রভু কৃপায় তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৮৯
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল ।
প্রভু-কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল ॥ ১৯০
প্রভু কহে—কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সভা হৈতে ।
তোমাকে কাটিল বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত হৈতে ॥ ১৯১
রঘুনাথ মনে কহে—কৃষ্ণ নাহি জানি ।
তোমার কৃপায় কাটিল আমি, এই আমি মানি ॥ ১৯২
প্রভু কহেন—তোমার পিতা-জ্যেষ্ঠা দুইজনে ।
চক্রবর্তিসম্বন্ধে হাম ‘আজা’ করি মানি ॥ ১৯৩
চক্রবর্তীর দৌহে হয় ভাতৃরূপ দাস ।
অতএব তাঁরে আমি করি পরিহাস ॥ ১৯৪
ইহার বাপ-জ্যেষ্ঠা বিষয়-বিষ্ঠাগর্তের কীড়া ।
‘সুখ’ করি মানি বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥ ১৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৮৩। ছত্রভোগ—বর্তমান সুন্দরবনের অন্তর্গত স্থান বিশেষ । সরান—প্রসিদ্ধ রাজপথ । কুগ্রাম—অপ্রসিদ্ধ গ্রাম । প্রয়াণ—গমন ।

১৮৪। ভক্ষণাপেক্ষা—ভোজনের অপেক্ষা ।

১৮৫। চর্বণ—শুকনা চানা-আদি চর্বণ ।

১৯০। প্রভু-কৃপা দেখি ইত্যাদি—রঘুনাথের প্রতি প্রভুর অত্যন্ত কৃপা দেখিয়া সকল বৈষ্ণবই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ।

১৯১। বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত—বিশয়রূপ-বিষ্ঠার গর্ত ।

১৯৩-১৯৪। তোমার পিতা জ্যেষ্ঠা—রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধনদাস এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা হিরণ্যদাস । চক্রবর্তী—নীলাশ্বর চক্রবর্তী, ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ । আজা—পশ্চিমবঙ্গে মাতামহকে আজা বলে ।

প্রভু বলিলেন,—“আমার আজা নীলাশ্বর-চক্রবর্তী হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসকে ছোট-ভাইয়ের মতন স্নেহ করেন ; তাঁহারাও আমার আজাকে বড় ভাইয়ের মতন শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন ; সেইভাবে তাঁহার সেবাও করেন । সুতরাং আমার আজার সম্বন্ধে আমি তাঁহাদিগকেও আজা বলিয়াই মনে করি । আমি তাঁহাদের নাতির তুল্য ; তাই আমি তাঁহাদিগকে সময় সময় পরিহাসাদিও করিয়া থাকি ।”

তারে—হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাসকে । পরিহাস—ঠাট্টা-বিদ্রূপ ।

১৯৫। এই পর্যায়ে আজা বলিয়া হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসকে প্রভু পরিহাস করিতেছেন ।

ইহার বাপ-জ্যেষ্ঠা—রঘুনাথের বাপ এবং জ্যেষ্ঠা । বিষয়-বিষ্ঠাগর্তের কীড়া—বিশয়রূপ বিষ্ঠাগর্তের কীট ।

প্রভু ঠাট্টা করিয়া বলিতেছেন,—“বিষ্ঠার কীট যেমন সর্ষদা বিষ্ঠাগর্তেই ডুবিয়া থাকে, তাহাতেই সুখ অনুভব করে, রঘুনাথের বাপ-জ্যেষ্ঠাও তেমনি সর্ষদা বিষয় নিয়াই ব্যস্ত, বিষয়ের যন্ত্রণাকে তাঁহারা যন্ত্রণা বলিয়াই মনে করেন না, পরন্তু অত্যন্ত সুখের বিষয় বলিয়াই মনে করেন ।” প্রভু ঠাট্টা করিয়া হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসকে বিষ্ঠার কীট বলিলেন । প্রভু তাঁহাদের নাতি কিনা, তাই দাদামহাশয়দিগকে এইরূপ-পরিহাস করিলেন ।

যত্নপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায় ।

| শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, হয়ে বৈষ্ণবের প্রায় ॥ ১৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৯৬। যদিও হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস অনেক ব্রাহ্মণকে বৃত্তি^১ দেন, অনেক ব্রাহ্মণকে সাময়িক ভাবেও অনেক সহায়তা করেন, তথাপি তাঁহাদের আচরণ সম্যকরূপে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আচরণ নহে, কোনও কোনও বিষয়ে বৈষ্ণবের আচরণের মতন হয় মাত্র।

যত্নপি ব্রহ্মণ্য ইত্যাদি—হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস ধার্মিক, সুপণ্ডিত এবং অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ইহাদের অর্থ-সাহায্যেই জীবিকা নির্বাহ করিতেন। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই ইহাদের বৃত্তি-ভোগী ছিলেন। অনেকেই নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেন; ব্রাহ্মণদিগকে বৎসর বৎসর অর্থদান করার বন্দোবস্তও ছিল। এতদ্ব্যতীত ইহাদের বাড়ীতে যাগ-যজ্ঞ-পূজা-অর্চনাদিতেও ব্রাহ্মণদিগের অনেক অর্থলাভ হইত। বস্তুতঃ, ইহাদের বদান্ধতায় নদীয়াবাসী অনেক ব্রাহ্মণই জীবিকা-নির্বাহ-সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতেন। “মহৈশ্বর্যবৃদ্ধে দৌহে বদান্ধ ব্রহ্মণ্য ॥ সদাচার সংকুলীন ধার্মিক-অগ্রগণ্য ॥ নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়। অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥ ২।১৬।২।১৬-১৭ ॥” সহস্র সহস্র দীনহুঃখীও ইহাদের বদান্ধতায় স্নেহে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত। ইহাদের দানশীলতার উল্লেখ করিয়া তখনকার লোকে বলিত—‘পাতালে বাসুকির্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ। গোঁড়ে গোবর্দ্ধনোদাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ—সঙ্গীতমাধব নাটক।’

ব্রাহ্মণের সেবা চৌবড়ি-অঙ্গ-সাধন-ভক্তির মধ্যেও একটা :—ধাত্র্যস্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন। ২।২২।৬৩।” অবশ্য ইহা বৈষ্ণবের মুখ্য ভজনাঙ্গ নহে, ভক্তিমার্গের আরম্ভ-স্বরূপ বা দ্বার-স্বরূপ বলিয়া যে বিশটী অঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটা মাত্র।

জাতিবর্ণ-নির্কিংশে বৈষ্ণবের প্রতিও হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। শ্রীল-হরিদাস ঠাকুর যখন তাঁহাদের সভায় গিয়াছিলেন, তাঁহাদের তখনকার আচরণই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হরিদাস-ঠাকুরের দর্শন মাত্রেই তাঁহারা গাত্ৰোত্থান করিলেন, পরে পায়ে পড়িয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলেন এবং অত্যন্ত সম্মান করিয়া তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন :—“ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান। পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান ॥ ৩।৩।১৬৫ ॥” প্রবল-প্রতাপাশ্রিত সংকুলীন কায়স্থ ভূম্যধিকারীর পক্ষে কাম্বাল যবন-হরিদাসের প্রতি এইরূপ সম্মান-প্রদর্শনেই তাঁহাদের চিত্তের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

গোপাল-চক্রবর্তি-নামক তাঁহাদের জনৈক ব্রাহ্মণ-কর্মচারী “ভাবক” বলিয়া হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি কিঞ্চিৎ অমর্যাদা দেখাইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎই তাহাকে কর্মচ্যুত করিয়াছিলেন। জাতিবর্ণ-নির্কিংশে বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহাদের কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, ইহাও তাহার একটা প্রমাণ।

শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে—শ্রীগননহাপ্রভু বলিলেন, হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন।

কিন্তু শুদ্ধ-বৈষ্ণব কাহাকে বলে? বাঁহার আচরণে, অঙ্গুষ্ঠানে এবং চিন্তায়, বৈষ্ণবের যাহা লক্ষ্য তাহার প্রতিকূল কিছুই থাকে না, সেই বৈষ্ণবকেই শুদ্ধ-বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। বৈষ্ণবের লক্ষ্য হইল—ভাবাকুল সিদ্ধদেহে ব্রহ্মেন্দ্র-নন্দনের প্রেম-সেবা-প্রাপ্তি, স্বস্থ-বাসনা-গন্ধ-শ্রুত কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাপ্রাপ্তি। এই উদ্দেশ্যে সাধক-বৈষ্ণব যে সাধন-ভক্তির অঙ্গুষ্ঠান করেন, তাহাতেও কৃষ্ণসুখ-বাসনা ব্যতীত অল্প সকল প্রকারের বাসনাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে হয়; তাহাতে, জ্ঞান-কর্ম-যোগাদির যে লক্ষ্য, তাহার ছায়াও থাকিতে পারিবে না; তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অঙ্গুষ্ঠান অঙ্গুষ্ঠান মাত্র—“অত্যাভিলাষিতাশ্রুতং জ্ঞানকর্ম্মাণ্যনাবৃতম্। আঙ্গুল্যেন কৃষ্ণাঙ্গুশীলনং ভক্তিক্রমম্ ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ১।১।১৯৯ ॥” সাধকের চিত্তে যদি ইহকালের ও পরকালের কোনওরূপ স্থখভোগের কামনা স্থান পায়, তাহা হইলে তাঁহার অঙ্গুষ্ঠান তাঁহার লক্ষ্য-প্রাপ্তির ঠিক অঙ্গুষ্ঠান হইবে না। ভক্তিরস ভজনং

তথাপি বিষয়ের স্বভাব—করে মহা অন্ধ ।

সেই কর্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ ॥ ১৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

ইহামুত্রোপাধিনৈরশ্চেন অমুখিন্ মনসঃ কল্পনম্ ।—প্রতি । মধ্যলীলার ২২শ পরিচ্ছেদে বৈষ্ণবাচার-প্রসঙ্গে শ্রীমন্-মহাপ্রভুও তাহাই বলিয়াছেন—অসং-সঙ্গ-ত্যাগ ইত্যাদি কতিপয় পয়ায়ে ২১২১৪৯-৫০ ॥

তাহা হইলে, কৃষ্ণকামনা ও কৃষ্ণভক্তি-কামনা ব্যতীত অগ্র কামনাই হইল বৈষ্ণবের বিশুদ্ধতার হানিজনক ; তাহাই বাস্তবিক হুঃসঙ্গ বা অসংসঙ্গ । “হুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আশ্র-বঞ্চনা । কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অগ্র কামনা ॥ ২২৪১৭০ ॥”

স্বস্থ-বাসনা হইতেই অগ্র কামনা জন্মে ; যত রকমের স্বস্থ-বাসনা আছে, বিষয়াসক্তিতেই তাহাদের অভিব্যক্তি । স্তুরাং বিষয়াসক্তি যতদিন পর্য্যন্ত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত চিন্তে অগ্র কামনা আছে বুঝিতে হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জগু প্রকৃত কামনা জন্মে নাই বুঝিতে হইবে । স্তুরাং ততদিন পর্য্যন্তই সাধারণ আচরণাদিতে বৈষ্ণবের লক্ষ্য-প্রাপ্তির প্রতিকূল অনেক বস্তু থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার প্রতি ভক্তির কৃপা হইতে পারে না । “ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে । তাবদ্ভক্তিস্থখশ্চাত্ত কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু । ১১২১৫ ॥” তাহা হইলে দেখা গেল, বিষয়াসক্তিই বৈষ্ণবের অবিশুদ্ধতার হেতু ; যতদিন বিষয়াসক্তি থাকিবে, ততদিন কেহই “শুদ্ধ-বৈষ্ণব” হইতে পারিবে না ।

হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের বিষয়াসক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয় প্রভু বলিয়াছেন—তাহারা শুদ্ধ-বৈষ্ণব নহেন, যেহেতু তাহাদের বিষয়াসক্তি অত্যন্ত বেশী—“ইহার বাপ-জ্যেষ্ঠা বিষয়-বিস্তারগর্তের কীড়া । স্থখ করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥—পূর্ববর্তী পয়ার ।”

তাহাদের বিষয়াসক্তির একটা দৃষ্টান্ত এই শ্রীগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় । গোড়রাজ যখন জানিতে পারিলেন যে হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস তাহাদের মোক্তা-মুলুক হইতে বিশলক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করেন, কিন্তু রাজ-সরকারে মাত্র বারলক্ষ টাকা খাজনা দেন, তখন আরও কিছু বেশী খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে তাহার উজীর হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত আসিলেন । কিন্তু তাহারা দুই ভাই-ই ভয়ে পলাইয়া গেলেন, রঘুনাথ-দাস ধরা পড়িয়া কিছু নির্গাতন ভোগ করিলেন । তাহারা যদি রাজসরকারে কিছু বেশী খাজনা দিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলেই সমস্ত গোলমাল চুকিয়া যাইত, তাহাদিগকে এত দুর্ভোগও ভুগিতে হইত না । কিন্তু তাহারা তাহা করিলেন না—ইহাতেই তাহাদের বিষয়াসক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ।

রঘুনাথের সম্বন্ধে হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের আচরণেও তাহাদের বিষয়াসক্তির পরিচয় পাওয়া যায় । গৌর-চরণে রঘুনাথের অমুরক্তিবশতঃ বিষয়সম্বন্ধে তাহাকে উদাসীন দেখিয়া তাহারা একটা পরমাসুন্দরী কিশোরীর সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া রঘুনাথকে বিষয়াসক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন, “এইরূপ হইলে বৈষ্ণবের পক্ষে সংসার করা অসম্ভব—গৃহী বৈষ্ণবদের মধ্যে “শুদ্ধ বৈষ্ণব” তাহা হইলে থাকিতেই পারে না ।” তাহা নহে—বৈষ্ণব সংসারে থাকিতে পারেন, গৃহী-বৈষ্ণবও শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইতে পারেন । গৃহী-বৈষ্ণবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“যথাযুক্ত বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা । ২১৬৮২৩৬ ॥” অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগে কোনও দোষ নাই । গৃহী-বৈষ্ণবের যদি বিপুল বিষয়-সম্পত্তি থাকে, শ্রীকৃষ্ণের বিষয়-জ্ঞানে তিনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অমূল্য কার্যে তিনি তাহা নিয়োজিত করিবেন । শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদরূপে তিনি তাহা ভোগ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেন । অম্বরীষ মহারাজ গৃহী ছিলেন, রাজা ছিলেন ; কিন্তু তিনিও শুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন । পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায়রামানন্দ, সেন-শিবানন্দ প্রভৃতিও গৃহী অথচ শুদ্ধ-বৈষ্ণব ছিলেন । বিষয়ভোগ দোষের নহে, বিষয়ে আসক্তিই দোষের ।

১৯৭ । তথাপি—পূর্ব পয়ারের “যতপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়” এর সঙ্গে এই “তথাপি” অর্থ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

যদিও হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাস ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের অনেক সহায়তা করেন, তথাপি বিষয়ের সংশ্রবে আছেন বলিয়া বিষয়ের স্বভাব বশতঃই তাঁহাদের ভববন্ধন দৃঢ়তর হইতেছে ।

বিষয়ের স্বভাব—বিষয়ের স্বরূপগত ধর্ম ।

মহা অঙ্ক—অত্যন্ত বিবেচনাশূণ্য, হিতাহিত-বিচার-ক্ষমতাহীন । বিষয়ের স্বরূপগত ধর্মই এইরূপ যে, বিষয়ের সংশ্রবে বিষয়ী লোক “মহ’আঙ্ক” হইয়া যায়, নিজের স্বরূপসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে হিতাহিত বিবেচনা-শূণ্য হইয়া যায় ; কিসে মায়াবন্ধন শিথিল হইবে, কিসে হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হইবে, কিসে শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখতা জন্মিবে, এই সকল বিষয়ে কোনওরূপ বিচার করার শক্তি তাহার থাকে না, তাই কৃষ্ণভক্তির অমূল্য কোনও কাজই প্রায় বিষয়ী লোক করিতে সমর্থ হয়না ; কেবল ইহাই নহে, বিষয়ের সংশ্রবে থাকাতে বিষয়েরই স্বরূপগত ধর্মবশতঃ লোক এমন সব কার্য্য করিতে উদ্যত হয়, যাহাতে তাহার সংসার-বন্ধন আরও বদ্ধিত হইয়া থাকে । বিষয়ই লোককে এসকল কার্য্য করায় । তাই হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস বিষয়ের সংশ্রবে আছেন বলিয়া প্রভু বলিয়াছেন, তাহারা শুদ্ধ-বৈষ্ণব নহেন ।

শ্রীমদমহাপ্রভুর কৃপায় যাহারা অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ করিতে সমর্থ, তাঁহাদের উপরে অবশ্যই বিষয়ের স্বরূপগত ধর্ম কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহারা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ থাকেন । কিন্তু এরূপ ভাগ্যবান জীবের সংখ্যা অত্যন্ত কম । সাধারণ জীব মায়িক স্মৃতির নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতেই মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া আছে, দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া দৈহিক-সুখাদিকেই নিজের সুখ মনে করিতেছে, দৈহিক সুখাদিকেই পরম সুখ বলিয়া মনে করিতেছে এবং দৈহিক সুখের সাধন জী-পুত্র-ধন-সম্পত্তি-আদি বিষয়কেই অত্যন্ত প্রিয়বস্তু বলিয়া মনে করিতেছে । অনাদিকাল হইতে এইরূপে বিষয়ের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া বিষয়ের সঙ্গে জীবের যেন একটা অমূল্য সম্বন্ধই জন্মিয়া গিয়াছে । তাই বিষয়ের সংশ্রবে আসিলেই তাহার বিষয়-বাসনা যেন জাগ্রত হইয়া উঠে । জীলোকের দর্শনমাত্রেই কামুক ব্যক্তির চিত্তে যেমন রমণী-সঙ্গের কামনা জন্মে, মদ দেখিলেই মদ্যাসক্তের চিত্তে যেমন পানের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে এবং নিজের আয়ত্বাধীনে মদ পাইলেই যেমন মদ্যাসক্ত ব্যক্তি মদ খাওয়ার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষয়ের সংশ্রবে আসিলেই বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্তে বিষয়-ভোগের বাসনা জাগ্রত হয় এবং নিজের আয়ত্বাধীনে কোনও বিষয় আসিলেই ঐ বিষয়ের ভোগে জীব প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । তাহার ফল এই দাঁড়ায় যে, তার পূর্বসম্বন্ধিত শত শত মায়াবন্ধন তো আছেই, তাহার উপর আবার বাসনা-বৈচিত্রীর প্ররোচনায় শত শত নূতন বন্ধনের সৃষ্টি হয় । তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ ॥”

এই পয়্যারের অভি প্রায় এই যে, যাহারা ভববন্ধন হইতে মুক্তি ইচ্ছা করেন এবং যাহারা শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, বিষয়ের সংশ্রব হইতে দূরে থাকাই তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ।

[বিষয়ের সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবার মত মনের অবস্থা যাহাদের হয় নাই, জী-পুত্র-ধন-সম্পত্তি আদি হইতে জোর করিয়া দূরে সরিয়া গেলেও তাঁহাদের ভজনের বিশেষ আনুকূল্য হইবে বলিয়া মনে হয় না ; তাহাতে বরং তাঁহাদের বিষয়ভোগের বাসনা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রবলতর হইয়া উঠিতে পারে এবং ভজনে বিশেষ বিঘ্ন জন্মাইতে পারে । অবশ্য, কোনও শক্তিধর মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে তাঁহার কৃপায় ভোগবাসনার নিরসন হইতে পারে । তাহা না হইলে বিষয়ের সংশ্রবে থাকিয়া যাবন্নির্বাহ-প্রতিগ্রহ-নীতি এবং কৃষ্ণপ্রেমভোগ-ত্যাগ-নীতি-অনুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার চেষ্টা করাই বোধ হয় তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে (২২২১৬২ পয়্যারের টীকা দ্রষ্টব্য) । এইভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহের সঙ্গে সঙ্গে ভজনাঙ্গের অমুষ্ঠান করিলে এবং সংসারাসক্তি দূর করিবার নিমিত্ত ভগবচ্চরণে কাতর প্রাণে প্রার্থনা জানাইলে, ভগবৎ-কৃপায় ক্রমশঃ তাঁহাদের বিষয়াসক্তি দূর হইতে পারে । কেবল জীবিকা-নির্বাহের উপযোগী বিষয়-সম্পত্তিই যাহার আছে, তাঁহার পক্ষে এই ভাবে জীবন-

হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা ।

কহনে না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা ॥ ১৯৮

রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া ।

স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্র-চিত্ত হঞা— ॥ ১৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

যাত্রা নির্বাহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ; অবশ্য বিষয়-সম্পত্তি বাড়াইবার নিমিত্ত যদি তিনি চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে খাল কাটিয়া কুমীর আনার মত অবস্থা হইবারই সম্ভাবনা ।

আর, যাহার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয় সম্পত্তি আছে, তাঁহাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে । প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি আছে বলিয়া তিনি যেন ভোগ-বিলাসাদিতে মত্ত হইয়া না উঠেন—যতটুকু না করিলে জীবন ধারণ করা যায় না, এবং লোক-সমাজে বাহির হওয়া যায় না, তাহার অতিরিক্ত যেন কিছু তিনি না করেন । “বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের, তাঁহার দাসরূপে আমি তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক মাত্র”—এই অভিমানে তিনি বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে চেষ্টা করিবেন, আর বিষয়-সম্পত্তি হইতে উৎপন্ন অর্থ নিজের ভোগে না লাগাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির অচ্যুত কার্য্যে ব্যয় করিতেই সর্বদা চেষ্টা করিবেন ।

এই শ্রেণীর বিষয়ী লোকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরমকরণ শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ দিয়াছেন যে, পরপুরুষে আসক্তা কুলটা রমণী গৃহকর্মে ব্যাপ্তা থাকিয়াও যেমন সর্বদাই তাহার উপপতির সহিত সঙ্গম-স্বথের কথাই চিন্তা করে, তদ্রূপ সংসারী লোক বাহিরে বিষয়-কর্ম্ম করিবে, কিন্তু তাহার মন যেন সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণচরণেই চুষ্ট থাকে । “পরব্যসিনি নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মত্ব । তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্বসঙ্গ-রসায়নম্ ॥—মধ্য, প্রথম-পরিচ্ছেদ-ধৃত বাশিষ্ট-রামায়ণ-বচন ।” এইরূপ ভাবে চলিতে পারিলে ভগবৎ-কৃপায় শীঘ্রই বিষয়াসক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায় ; তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন “যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥ অন্তর্নিষ্ঠা কর বাছে লোকব্যবহার । অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবেন উদ্ধার ।” ২।১৬।২৩৬-৩৭ ।]

১৯৮ । এই পয়ার রঘুনাথের প্রতি প্রভুর উক্তি ।

হেন বিষয়—যে বিষয় বিষ্ঠাগর্ভের তুল্য, যে বিষয়ের স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, ইহার সংশ্লেষে আসিলেই জীব মহা অন্ধ হইয়া যায়, তাহার ভববন্ধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই বিষয় । কহনে না যায় ইত্যাদি—কৃষ্ণ-কৃপার মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করা যায় না ।

১৯৯ । ক্ষীণতা—কৃশতা ; অনাহার ও পথের পরিশ্রমে রঘুনাথের শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছিল । মালিন্য—দেহের মলিনতা ; রীতিমত স্নানাদির অভাবে এবং পথে রৌদ্রের তাপে রঘুনাথের দেহ মলিন হইয়া গিয়াছিল । স্বরূপেরে কহে—প্রভু স্বরূপ-দামোদরকে বলিলেন ; যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্তী দুই পয়ায়ে ব্যক্ত আছে । কৃপা-আর্দ্র চিত্ত—রঘুনাথের প্রতি কৃপা-বশতঃ চিত্ত আর্দ্র (দ্রবীভূত) হইয়াছে যাহার । রঘুনাথের দেহের কৃশতা ও মলিনতা দেখিয়া প্রভুর অত্যন্ত কৃপা হইল । “আহা, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত রঘুনাথ কত কষ্ট করিয়াছে ; কত তাহার উৎকর্ষা ; ইন্দ্রের তুল্য ঐশ্বর্য্য, অমরার ছায় স্তন্দরী যুবতী স্ত্রী ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে ; গৃহে থাকা কালে যে কখনও মাটিতে পা ফেলিত কিনা সন্দেহ, কত উপাদেয় ভোগ্যবস্তু যাহার ভুক্তাবশেষ-রূপেও পড়িয়া থাকিত, প্রাসাদতুল্য গৃহে দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় যাহার নিদ্রার আয়োজন হইত, সেই রঘুনাথ খালি পায়ে দুর্গম পথে অনাহারে অনিদ্রায় সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া সপ্তগ্রাম হইতে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ! কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্ত কত তাঁহার উৎকর্ষা !”—ইত্যাদি ভাবিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্ত রঘুনাথের প্রতি কৃপায় গলিয়া গেল ।

বাস্তবিক কেবলমাত্র সাধনাদের অহুষ্ঠানেই যে ভগবৎকৃপা পাওয়া যায়, তাহা নহে সাধনের ঐকান্তিক আকুলতাই ভগবৎ-কৃপা লাভের একমাত্র হেতু । এই ঐকান্তিক আকুলতা বুঝা যায়, ভগবৎ-প্রাপ্তির সাধন যে ভজনাঙ্গ,

এই রঘুনাথে আমি মৌপিল তোমারে ।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥ ২০০
তিন ‘রঘুনাথ’ নাম হয় আমার গণে ।

‘স্বরূপের রঘুনাথ’ আজি হৈতে ইহার নামে ॥ ২০১
এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিল ।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈল ॥ ২০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাহার অমুঠানের পরিশ্রমাদি দ্বারা । ঐবের সাধন-পরিশ্রমে তাঁহার ঐকান্তিক আকুলতা দেখিয়া নারায়ণের কৃপা হইল, তিনি নারদকে ঐবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন । দাম-বন্ধন-লীলায় যশোদা-মাতার আশ্রিত ও ক্লান্তি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইল, তিনি বন্ধন স্বীকার করিলেন । রঘুনাথের পথশ্রান্তি-জনিত ক্লান্ততা ও মলিনতা দেখিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হইল, তিনি তাঁহাকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করিলেন ।

২০০। এই রঘুনাথে ইত্যাদি—প্রভু স্বরূপ দামোদরকে বলিলেন—“স্বরূপ! রঘুনাথকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; আজ হইতে রঘুনাথ তোমার; তুমি নিজের পুত্রজ্ঞানে, নিজের ভৃত্যজ্ঞানে ইহাকে গ্রহণ করিবে, ইহাই আমার অমুরোধ ।”

পুত্রভৃত্যরূপে—পুত্ররূপে এবং ভৃত্যরূপে । পিতার ঐকান্তিক স্নেহের পাত্র হয় পুত্র; আবার পিতার সম্পত্তির অধিকারীও হয় পুত্র; পিতা তাঁহার সমস্ত উত্তম সম্পত্তিই রাখিয়া যাতেন পুত্রের জন্ত এবং সেই সম্পত্তি রক্ষা করার কৌশলও পিতাই পুত্রকে শিক্ষা দিয়া থাকেন । আর ভৃত্যের কার্য্য হইল সেবাদি দ্বারা প্রভুর শ্রীতি সম্পাদন; প্রভুরও কার্য্য হইল ভৃত্যকে নিজের সেবা দেওয়া এবং সর্ব্বতোভাবে ভৃত্যের পালন করা । শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—“স্বরূপ, এই রঘুনাথকে তুমি তোমার পুত্ররূপে এবং ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার কর । শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ তোমার যে অতুলনীয় ধনসম্পত্তি আছে, রঘুনাথকে সেই ধনের অধিকারী করিয়া লও এবং কি উপায়ে সেই ধন প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করা যায়, কিরূপে সেই ধন রক্ষা করা যায়, তুমি রঘুনাথকে তাহা শিক্ষা দাও । রঘুনাথকে তুমি তোমার সেবা করিতে দিও (ভঙ্গীতে রঘুনাথকেও বলিলেন,—তুমি স্বরূপের সেবা করিও) । স্বরূপ, তুমি রঘুনাথকে সর্ব্বতোভাবে পালন করিও ।” এস্থলে পালন বলিতে দেহের পালনই প্রভুর অভিপ্রেত নয়; ভক্তির পালনই অভিপ্রেত—কিরূপে রঘুনাথের চিন্তে ভক্তি পুষ্টি লাভ করিতে পারে, কিরূপে সেই ভক্তি রক্ষিত হইতে পারে, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টিই হইতেছে বাস্তবিক পালন ।

প্রভুর এই সমস্ত উক্তিতে রঘুনাথের প্রতি তাঁহার অপরিমিত করুণাই স্বচিত হইতেছে ।

২০১। তিন রঘুনাথ—তপনমিশ্রের পুত্র এক রঘুনাথ, রঘুনাথ-বৈষ্ণব দ্বিতীয় রঘুনাথ, আর রঘুনাথ দাস তৃতীয় রঘুনাথ । এই তিন জনের মধ্যে ঐদিন হইতে রঘুনাথ দাসের নাম হইল “স্বরূপের রঘুনাথ”; “স্বরূপের রঘুনাথ” বলিলে রঘুনাথ দাসকেই বুঝাইত ।

আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে প্রেমকল্পতরুর শ্রীচৈতন্যরূপ মুখ্যশাখার নামবিবরণে প্রভুর গণের মধ্যে উক্ত তিনজন রঘুনাথের নামই পাওয়া যায় । “রঘুনাথ বৈষ্ণব আর রঘুনাথ দাস (১১০১২৪) ॥ রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—মিশ্রের নন্দন ॥ (১১০১৫১) ॥” শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর গণের মধ্যেও এক রঘুনাথের নাম পাওয়া যায়; “রঘুনাথবৈষ্ণব উপাধ্যায় মহাশয় ১১১১১৯ ॥” আবার শ্রীমদবৈতাচার্য্য-প্রভুর গণেও এক রঘুনাথের নাম পাওয়া যায় । “গুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ ১১১২৬১ ॥” কিন্তু এই দুই রঘুনাথের কেহই সাক্ষাদভাবে মহাপ্রভুর গণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত হয়েন নাই ।

২০২। রঘুনাথের হাতে ধরিয়া প্রভু নিজেই যেন আগে তাঁহাকে অঙ্গীকার করিলেন । তারপর শ্রীস্বরূপ-দামোদরের হস্তে অর্পণ করিয়া প্রভু যেন জানাইলেন—“স্বরূপ, আমার এই রঘুনাথের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমি তোমার হস্তেই অর্পণ করিলাম ।”

স্বরূপ কহে—মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল ।
 এত কহি রঘুনাথে পুন আলিঙ্গিল ॥ ২০৩
 চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য কহিতে না পারি ।
 গোবিন্দের কহে রঘুনাথে দয়া করি— ॥ ২০৪
 পথে ইহঁা করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন ।
 কথোদিন কর ইহঁার ভাল সন্তুর্পণ ॥ ২০৫
 রঘুনাথে কহে—ঘাই কর সিন্ধুস্নান ।
 জগন্নাথ দেখি আসি করহ ভোজন ॥ ২০৬
 এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিল ।
 রঘুনাথদাস সব ভক্তেরে মিলিল ॥ ২০৭

রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ ।
 বিস্মিত হঞা করে তাঁর ভাগ্য-প্রশংসন ॥ ২০৮
 রঘুনাথ সমুদ্রে ঘাই স্নান করিল ।
 জগন্নাথ দেখি পুন গোবিন্দপাশ আইলা ॥ ২০৯
 প্রভুর অবশিষ্টপাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল ।
 আনন্দিত হঞা রঘুনাথ প্রসাদ পাইল ॥ ২১০
 এইমত রহে তেঁহো স্বরূপ-চরণে ।
 গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দিল পঞ্চদিনে ॥ ২১১
 আরদিন হৈতে পুষ্প-অঞ্জলি দেখিয়া ।
 সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া ॥ ২১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টকা ।

২০৩। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া স্বহস্তে রঘুনাথদাসের হাত ধরিয়া যখন স্বরূপদাগোদরের হস্তে অর্পণ করিলেন, তখন স্বরূপ প্রভুর অভিপ্রায়-অনুসারে রঘুনাথকে অঙ্গীকার করিলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় অঙ্গীকার জানাইলেন ।

২০৪। গোবিন্দ—প্রভুর সেবক গোবিন্দ ; রঘুনাথে দয়া করি—রঘুনাথের প্রতি দয়া করিয়া (প্রভু গোবিন্দকে বলিলেন) ।

২০৫। এই পয়ার গোবিন্দের প্রতি প্রভুর উক্তি । ইহঁা—রঘুনাথ । লঙ্ঘন—উপবাস । কথোদিন—কয়েক দিন । ভাল সন্তুর্পণ—ভাল রূপে আহাৰাদি দিয়া বিশেষ রূপে তৃপ্তি ।

২০৮। বিস্মিত হঞা—রঘুনাথের প্রতি প্রভুর অসাধারণ কৃপা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যায়িত হইলেন ।

২১০। অবশিষ্ট পাত্র—ভুক্তাবশেষ ।

২১১। গোবিন্দ প্রসাদ ইত্যাদি—গোবিন্দ রঘুনাথকে পাঁচ দিন মাত্র প্রসাদ দিয়াছিলেন । নীলাচলে উপস্থিত হওয়ার পরে প্রথম পাঁচ দিন মাত্র রঘুনাথ গোবিন্দের নিকটে প্রসাদ পাওয়ার নিমিত্ত গিয়াছেন ; পাঁচ দিনের পরে তিনি ইচ্ছা করিয়াই গোবিন্দের নিকটে ঘাইতেন না ।

২১২। “আর দিন হৈতে” হইতে “কৃপাত করিয়া” পর্য্যন্ত তিন পয়ার । রঘুনাথ দাস নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর ; তাঁহার সাধনের, বা সাধনের অমুকূল বৈরাগ্যের কোনও প্রয়োজনই ছিল না । তথাপি মায়াবদ্ধ জীবের নিমিত্ত ভক্তনের আদর্শ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে প্রভু রঘুনাথের মধ্যে সাধারণ জীব-ভাব প্রকট করিয়াছেন । সংসারী জীবের মধ্যে যিনি ভজনে যত উচ্চ অধিকারী, তিনিই নিজেকে তত বেশী অযোগ্য, তত বেশী অধম মনে করেন, নিজের শক্তির উপরে তাঁহার আস্থা ততই অধিক রূপে লোপ পাইতে থাকে । তাই রঘুনাথ দাস পাঁচ দিন পর্য্যন্ত গোবিন্দের দেওয়া প্রভুর অবশেষ-পাত্র পাইলেন, পাইয়া বোধ হয় তিনি একরূপ বিচার করিলেন :—“আনি মায়াবদ্ধ জীব, অনাদিকাল হইতেই ত্রীকৃষ্ণ-সেবা ভুলিয়া দেহের সেবাতেই মত্ত হইয়া আছি, দেহের সুখানুসন্ধানই সর্বদা ব্যাপ্ত আছি । কিন্তু যত দিন আত্ম-সুখানুসন্ধান থাকিবে, তত দিন কৃষ্ণ-কৃপার কোনও আশাই নাই । শিশুকাল হইতেই স্নেহশীল পিতা-মাতা-জ্যেষ্ঠা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের আদর-যত্নে প্রচুর পরিমাণে সুখভোগ করিয়া আসিতেছি । প্রভুর কৃপায় গৃহ ছাড়িয়া এখানে আসিলাম, প্রভুর অবশেষ পাইয়া কৃতার্থ হইলাম ; সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দের আদর-যত্নও পাইতে লাগিলাম । বাড়ীতে যে ভাবে ছিলাম, এখানেও প্রায় তেমনই—তেমনি আদর-যত্ন, তেমনি অনায়াস-

জগন্নাথের সেবক, যত বিষয়ীর গণ ।

সেবা সারি রাত্রে করে গৃহে গমন ॥ ২১৩

সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া ।

পমারির ঠাণ্ডি অন্ন দেয়ায় কৃপা ত করিয়া ॥ ২১৪

এইমত সর্বকাল আছে ব্যবহারে ।

নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বারে ॥ ২১৫

সর্বদিন করে বৈষ্ণব নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন ।

স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ-দর্শন ॥ ২১৬

কেহো ছত্রে মাগি খায় যেবা কিছু পায় ।

কেহো রাত্রে ভিক্ষা-লাগি সিংহদ্বারে রয় ॥ ২১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টকা ।

লব্ধ আহাৰ্য্য । কিন্তু এই ভাবে আদর-যত্ন ও অনায়াস-লব্ধ আহাৰ্য্য পাইতে থাকিলে আমার চিরকালের অভ্যস্ত আত্মসুখ-স্পৃহা—প্রভুর কৃপায় যাহাতে একটু ভাটা পড়িয়াছে—সেই আত্মসুখ-স্পৃহায় আবার জোয়ার আসিতে পারে ; এই জোয়ারের মুখে,—এখন যে কৃষ্ণভক্তি লাভের নিমিত্ত একটু ক্ষীণ ইচ্ছা জন্মিয়াছে—তাহাও হয়ত বহু দূরে ভাসিয়া যাইতে পারে । সুতরাং গোবিন্দের এই আদর-যত্ন হইতে আমাকে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে, অনায়াস-লব্ধ মহাপ্রসাদের অপেক্ষায় আর এখানে থাকিলে আমার চলিবে না ।” এসব ভাবিয়াই বোধ হয় রঘুনাথ অল্প উপায় অবলম্বন করিলেন । ষষ্ঠ দিন হইতে, সমস্ত দিন নিজে ভজন করিতেন, আর শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন, দিনের মধ্যে আর খাওয়া দাওয়ার কোনও চেষ্টাই করিতেন না । অধিক রাত্রিতে যখন শ্রীজগন্নাথের শয়ন হইয়া যাইত, তখন আর দর্শনের সুযোগ থাকিত না বলিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিতেন ; আসিয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইতেন । জগন্নাথের সেবকগণ সেবার কার্য্য সমাধা করিয়া সিংহদ্বার দিয়া গৃহে ফিরিবার সময়ে রঘুনাথকে দেখিলে যদি কাহারও দয়া হইত, তবে তিনি মহাপ্রসাদের দোকান হইতে কিছু মহাপ্রসাদ লইয়া তাঁহাকে দিতেন ; তাহা আহাৰ্য্য করিয়াই রঘুনাথ তৃপ্তি অন্বেষণ করিতেন । বিশলক্ষ টাকা আয়ের সপ্তগ্রাম-মুল্লুকের একমাত্র উত্তরাধিকারী রঘুনাথ-দাস এই ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন ।

আর দিন হইতে—প্রথম পাঁচদিনের পর হইতে । পুষ্প-অঞ্জলি—শ্রীজগন্নাথের চরণে পুষ্পাঞ্জলি ; রাত্রিতে এই পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয় ; ইহাই শ্রীজগন্নাথের শেষ সেবা ; ইহার পরেই শয়ন দেওয়া হয়, সুতরাং আর দর্শন পাওয়া যায় না । সিংহদ্বার—শ্রীজগন্নাথের অঙ্গনের পূৰ্বদিকস্থ সদর-দ্বার । খাড়া রহে—দাঁড়াইয়া থাকেন ।

২১৩ । বিষয়ীর গণ—যাহারা জী-পুত্রাদি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে আছেন, সুতরাং শ্রীজগন্নাথের সেবার কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহকাৰ্য্যাদির অনুরোধে যাহারা নিজ নিজ গৃহে গমন করেন ।

কোনও কোনও গ্রন্থে “যত বিষয়ীর গণ” স্থলে “আর বিষয়ীর গণ” পাঠ আছে । এইরূপ পাঠান্তর-স্থলে এই পয়ারাঙ্কের অর্থ এইরূপ হইবে :—জগন্নাথের সেবকগণ এবং যে সমস্ত বিষয়ী (সংসারী) লোক শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে গিয়াছিলেন, তাহারা ।

সেবা সারি—শ্রীজগন্নাথের সেবার কার্য্য সমাধা করিয়া ।

২১৪ । অন্নার্থী বৈষ্ণব—যে বৈষ্ণব প্রসাদান্ন পাওয়ার আশায় দাঁড়াইয়া আছেন ।

পমারি—মহাপ্রসাদ-বিক্রেতা দোকানদার ।

২১৫-১৭ । “এইমত সর্বকাল” হইতে “সিংহদ্বারে রয়” পর্য্যন্ত তিন পয়ার । কেবল রঘুনাথ দাসই যে ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকিতেন, তাহা নহে । অনেক নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবই এইরূপ আচরণ করিতেন । আবার কেবল মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসের সময়েই যে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ এইভাবে ভিক্ষার্থী হইতেন, তাহাও নহে । সকল সময়েই, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ সমস্ত দিন নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন করেন, যথেষ্টভাবে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন ; আহাৰ্য্যের অল্প কেহ বা দিনে ছত্রে বাইয়া বাহা কিছু পানেন, তাহা খাইয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন, রাত্রিতে আর আহাৰ্য্য করেন না ;

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান ।
 যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর ভগবান্ ॥ ২১৮
 গোবিন্দ প্রভুকে কহে—রঘুনাথ প্রসাদ না লয় ।

রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হৈয়া মাগি খায় ॥ ২১৯
 শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিল— ।
 ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল ॥ ২২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

আবার কেহ বা সমস্ত দিন কিছুই আহার করেন না, আহারের কোনও চেষ্টাও করেন না, রাত্রিতে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া যাহা কিছু পায়েন, তাহা খাইয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ।

নিষ্কিঞ্চন ভক্ত—যিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের উদ্দেশ্যে স্ত্রী-পুত্র-বিষয়-সম্পত্তি ছাড়িয়া কাঞ্চাল সাজিয়াছেন এবং যখন যাহা কিছু মিলে, তাহা আহার করিয়াই তৃপ্তি লাভ করতঃ ভজনাঙ্গের অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন । ২১২২১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

ছত্র—অন্নদানের স্থান ; অন্নসত্র ।

২১৮ । **বৈরাগ্য**—কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ । শুষ্ক বৈরাগ্য নহে ; কেবল বৈরাগ্যের জন্ত যে বৈরাগ্য, তাহাও নহে ।

বৈরাগ্য প্রধান—মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যে কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে । অন্য সাধকদের মধ্যেও বৈরাগ্য থাকিতে পারে ; কিন্তু তাহা সাধারণতঃ শুষ্ক বৈরাগ্য, বৈরাগ্যের জন্যই বৈরাগ্য । কিন্তু গৌরভক্তদের বৈরাগ্যের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি বা শ্রীগৌরপ্রীতি হইতেই ইহার উদ্ভব ; ইহা যথেষ্ট আয়াস হইতে লব্ধ নয়, ইহা অনায়াস-লব্ধ । যতটুকু কৃষ্ণপ্রীতি বা গৌরপ্রীতি হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, ততটুকু বৈরাগ্য আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে । গৌরভক্তের চেষ্টা হয় গৌর-প্রীতির পুষ্টির জন্য, বৈরাগ্য লাভের জন্য তাঁহার স্বতন্ত্র চেষ্টা বিশেষ থাকেনা । স্বতন্ত্র চেষ্টার সার্থকতাও বিশেষ নাই । নিজের চেষ্টায় কেহ অমানিশার অন্ধকার দূর করিতে পারেনা ; তাহাকে সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় ; সূর্য্যোদয় হইলেই অন্ধকার দূর হইয়া যায় ; সূর্য্যের আলোক যত বেশী বিকীর্ণ হইবে, অন্ধকারও তত বেশী দূরীভূত হইবে । তদ্রূপ, নিজের ইচ্ছায় বা চেষ্টাতেই কেহ বিষয়াসক্তি দূর করিতে পারেনা ; এই আসক্তি হইল বহিরঙ্গা মায়া প্রভাব ; জীবের কোনও সামর্থ্যই নাই, যদ্বারা এই মায়াকে দূর করিতে পারা যায় । মায়াকে দূর করিতে পারেন—একমাত্র স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপশক্তির বৃত্তি বিশেষ ভক্তি বা প্রীতি । এই ভক্তির বা প্রীতির উন্মেষ যত বেশী হইবে, সংসারাসক্তিও ততই তিরোহিত হইবে । যাহারা শ্রীশ্রীগৌরমুন্দরের চরণাশ্রিত, গৌরের অসাধারণ কৃপাধারা তাঁহাদের মস্তকে বসিত হয় ; তাহারই প্রভাবে তাঁহাদের চিতে গৌর-প্রীতি পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে ; তাই তাঁহাদের মধ্যে অনায়াস-লব্ধ-বৈরাগ্য প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে । শ্রীশ্রীগৌরমুন্দরের মত কৃপার অভিব্যক্তি অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপে নাই । আরও একটী গুণ রহস্তও বোধহয় আছে । “রসরাজ-মহাতাব-দুইয়ে একরূপ” শ্রীশ্রীগৌরের অসমোর্ক্স মাধুর্য্যে গৌরভক্তদের চিত্ত এতই আকৃষ্ট হয় যে, অপর কোনও বিষয়ের অহুস্কানই আর তাঁহাদের থাকেনা ; তাই তাঁহাদের মধ্যে বৈরাগ্য প্রধান ।

যাহা দেখি ইত্যাদি—গৌরভক্তদের বৈরাগ্য হইল তাঁহাদের গৌরপ্রীতির বা কৃষ্ণপ্রীতির পরিচায়ক । তাঁহাদের বৈরাগ্য-লক্ষিত কৃষ্ণপ্রীতি দেখিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীতি অহুভব করেন ।

২২০ । রঘুনাথের আচরণের কথা গোবিন্দ যাইয়া মহাপ্রভুর নিকট বলিলেন । শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন । প্রভু বলিলেন—“রঘুনাথ বেশ উত্তম কাজই করিতেছে ; ইহাই নিষ্কিঞ্চনের কর্তব্য ।”

বৈরাগীর ধর্ম্ম—নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের কর্তব্য ।

বৈরাগী করিব সদা নামসঙ্কীৰ্তন ।

মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ ॥ ২২১

বৈরাগী হইয়া যেন করে পরাপেক্ষা ।

কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ ২২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

২২১। “বৈরাগী করিব” হইতে “কৃষ্ণ নাহি পায়” পর্য্যন্ত পাঁচ পয়ারে প্রভু নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের কি কৰ্ত্তব্য, তাহা বলিতেছেন ।

বৈরাগী করিব ইত্যাদি—সৰ্বদা অবিচ্ছেদে নাম-সঙ্কীৰ্তন করাই নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণবের কৰ্ত্তব্য । আহারের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হওয়া, বা কোনও একস্থানে স্থায়ীভাবে আহারের সংস্থান করা তাঁহার কৰ্ত্তব্য নহে ; তবে ভজনের নিমিত্ত বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন ; বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কিছু আহারেরও প্রয়োজন । তাই মাগিয়া যাচিয়া যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করিতে হইবে, তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিয়া সৰ্বদা প্রসন্ন চিত্তে শ্রীহরিনাম কীৰ্ত্তন করিতে হইবে ।

ভিক্ষালব্ধ আহার্যের উপকারিতা অনেক । প্রথমতঃ, ভিক্ষার্থীর চিত্তে কোনওরূপ অহঙ্কারের উদ্রেক হইতে পারে না ; তাহার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়, নিজের সম্বন্ধে তাহার হীনতা জ্ঞান জন্মে, তাহার পক্ষে “তৃণাদপি স্ননীচ” হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হয় । দ্বিতীয়তঃ, ভিক্ষার সময়েও নাম-সঙ্কীৰ্তন চলিতে পারে ; সুতরাং উদরান্নের সংস্থানের জন্ত তাহাকে এক মুহূর্তের জন্তও ভজন ত্যাগ করিতে হয় না । তৃতীয়তঃ, ভিক্ষা পরাপেক্ষা ছাড়াইয়া একমাত্র ভগবানে মনের নিষ্ঠা জন্মাইয়া দেয় । চতুর্থতঃ, দানের বস্তু যদি অত্যন্ত বেশী হয়, তাহা হইলে দাতার মনে অহঙ্কার ও দস্তাদি জন্মিতে পারে ; দাতার মানসিক ভাবের দ্বারা ঐ দানের বস্তু দূষিত হইয়া যায় ; সেই বস্তু গ্রহণ করিলে দান-গ্রহণকারীর চিত্তও কলুষিত হইয়া যায় ; আবার বেশী বস্তু দান করার ক্ষমতাও অনেকের নাই, তথাপি লোক-লজ্জা বা চক্ষু-লজ্জার বশীভূত হইয়া, কিম্বা যাচকের অনুরোধে, উপরোধে বাধ্য হইয়া কেহ কেহ সাধ্যাতীত ভাবেও দান করিয়া থাকেন ; এইরূপ দানে দাতার চিত্তে একটু কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ; তাহাতে দানের বস্তুও দূষিত হইয়া পড়ে ; এইরূপ বস্তু গ্রহণ করিলেও যাচকের চিত্ত কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে । কিন্তু একমুষ্টি চাউল দিতে প্রায়ই কাহারও কষ্ট হয় না, কাহারও চিত্তে দস্ত-অহঙ্কার জন্মিবার সম্ভাবনাও থাকে না । তাই মুষ্টি-ভিক্ষায় অন্নদাতার মনের ভাব দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই । অবশ্য, যাহারা একমুষ্টি চাউল দিতেও অক্ষম, কিম্বা একমুষ্টি চাউল দিয়াও যাহারা দস্ত-অহঙ্কারাদি প্রকাশ করে, তাহাদের নিকটে মুষ্টিভিক্ষা যাজ্ঞা করাও বোধ হয় সাধকের ভজনের অমূল্য হইবে না । যাহা প্রীতির দান, তাহাই উত্তম ।

২২২। পরাপেক্ষা—উদরান্নের নিমিত্ত পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা । কার্য্যসিদ্ধি—অভীষ্ট-সিদ্ধি, বাঞ্ছিত বস্তুলাভ । এখানে কার্য্যসিদ্ধি বলিতে বোধ হয় কৃষ্ণপ্রেম লাভকেই বুঝাইতেছে ; কাবণ, বৈরাগীর কার্য্যসিদ্ধি বলিতে অপর কোনও বস্তুকেই বুঝাইতে পারে না—বৈরাগীর অভীষ্ট-বস্তুই হইল কৃষ্ণপ্রেম ।

বৈরাগী হইয়া ইত্যাদি—যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের উদ্দেশ্যেই সংসার-ত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চনের বেশ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি উদর-নির্বাহের নিমিত্ত অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন, তবে ভজনে অগ্রসর হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপেক্ষা করেন ; কারণ, যিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কৃপার উপরেই সৰ্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকেন, আশ্রিত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই কৃপা করেন ; আর যে ব্যক্তি নিজের দেহের ভরণ পোষণের নিমিত্ত অপরের অপেক্ষা করে, শ্রীকৃষ্ণের উপরে যে তাহার সম্পূর্ণ নির্ভরতা নাই, শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় যে তাহার বিশেষ আস্থা নাই, তাহার আচরণে তাহাই প্রতিপন্ন হয় । শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার উপরে যাহার সম্যক্ আস্থা নাই, শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে সম্যক্ কৃপা করেন না ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাই এই যে, “যে যথা মাং প্রপদন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্—গীতা ।” যিনি শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে সেই ভাবে কৃপা করেন ; শ্রীকৃষ্ণের উপরে যাহার সম্যক্ নির্ভরতা আছে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাও তাঁহার প্রতি সম্যক্রূপে প্রকটিত হয় ; আর শ্রীকৃষ্ণের উপরে

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

স্বাভাবিক সম্যক নির্ভরতা নাই, তাঁহার রূপাও তাহার বিষয়ে সম্যক প্রকটিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-রূপার সম্যক প্রাকট্যাভাবকেই শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বলা হইয়াছে।

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, রূপা-বিতরণে শ্রীকৃষ্ণের তবে পক্ষপাতিত্ব আছে? না, তাহা নাই; শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ-পাতিত্ব থাকিতে পারে না। সূর্য যেমন পৃথিবীস্থ সকল বস্তুর উপরে সমভাবেই তাপ-বিতরণ করিতেছেন, কিন্তু তাপ-গ্রহণের যোগ্যতার তারতম্য-অনুসারে কোনও বস্তু অধিক উত্তপ্ত হয়, কোনও বস্তু কম উত্তপ্ত হয়, আবার কোনও বস্তু হয়তো মোটেই উত্তপ্ত হয় না; সেইরূপ পরমকরণ শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবের নিমিত্তই তাঁহার করুণার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, গ্রহণের যোগ্যতা-অনুসারে জীব তাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকে। অথবা, স্নেহময়ী জননী তাঁহার সন্তানদিগের রুচি, প্রকৃতি ও শরীরের অবস্থা বিবেচনায় যেমন তাহাদের জন্ম ভিন্ন ভিন্ন আহার্যের যোগাড় করিয়া থাকেন, তাহাতে যেমন কোনও সন্তানের প্রতিই মাতার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইতে পারেনা, তদ্রূপ পরম-করণ শ্রীকৃষ্ণও জীবের রুচি, প্রকৃতি ও চিত্তের অবস্থাভেদে তাহাদের জন্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁহার রূপা প্রকট করিয়া থাকেন; ইহাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব কিছুই নাই; পূর্ববয়স্ক লোকের যেরূপ আহার্যের প্রয়োজন, যেরূপ বস্ত্রাদির প্রয়োজন, পাঁচমাসের শিশুর পক্ষে তাহার কোনও প্রয়োজনই নাই, তাহা বরং তাহার পক্ষে অনিষ্টকরই হইয়া থাকে।

সূর্য্যরশ্মি সকল কাছেই পতিত হইতে পারে; যে কাচের স্থূলমধ্য স্থূল, তাহাতে পতিত হইলে রশ্মিগুলি একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া ঔজ্জ্বল্য ও দাহিকাশক্তি ধারণ করে; তাহাতে কোনও দাঙ্ঘ বস্তু স্থাপন করিলে তাহা দগ্ধ হইয়া যায়। অত্যাচারে এইরূপ হয় না। ইহা সূর্য্যের পক্ষ-পাতিত্বের ফল নহে; ইহা হইতেছে—কাচের সূর্য্যরশ্মি গ্রহণের যোগ্যতার তারতম্যের ফল। ভক্তের চিত্ত স্থূলমধ্য কাচের তুল্য; তাহাতে ভগবানের রূপারশ্মি কেন্দ্রীভূত হইয়া এক বৈশিষ্ট্য ধারণ করিয়া থাকে। অভক্তের চিত্তের তদ্রূপ যোগ্যতা নাই। ইহাতেও ভগবানের পক্ষপাতিত্ব কিছু নাই। শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—“সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন মে প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ গীতা। ৯।২২ ॥—সকল জীবই আমার পক্ষে সমান; আমার দ্বেষও কেহ নাই, আমার প্রিয়ও কেহ নাই। কিন্তু যিনি ভক্তিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত, আমিও তাঁহাতে আসক্ত।” সকলের প্রতি সমান ভাব (বা সমান রূপা)—ইহা হইল যেন সাধারণ বিধি (সূর্য্যের পক্ষে সমভাবে কিরণ-বিতরণের স্থায় সাধারণ বিধি); কিন্তু অকপট ভক্তের সম্বন্ধে একটা বিশেষ বিধিও আছে। ভক্ত ভগবানে আসক্ত, অভক্ত তাঁহাতে আসক্ত নহে; ইহা হইল অপর লোক অপেক্ষা ভক্তের বৈশিষ্ট্য (যেমন সূর্য্যরশ্মি-গ্রহণ সম্বন্ধে অপর কাচ অপেক্ষা স্থূলমধ্য কাচের বৈশিষ্ট্য)। ভক্তের এই বৈশিষ্ট্যের ফলে ভক্তসম্বন্ধে ভগবানেরও একটা বৈশিষ্ট্য জন্মে; তাহা হইতেছে এই :—ভগবানও ভক্তের প্রতি আসক্ত—“যে যথা মাং প্রপদন্তে তাং স্তুখৈব ভজাম্যহম্”—এই নীতি অনুসারে। ভক্তির ভগবদ্-বশীকরণী শক্তি আছে। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ—শ্রুতি। ভক্তির এই শক্তিবশতই ভগবান্ ভক্তের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়েন। ভক্তব্যতীত অপরের মধ্যে ভগবদ্-বশীকরণী শক্তিসম্পন্ন ভক্তি নাই বলিয়া ভক্তব্যতীত অপরের প্রতি ভগবানের আসক্তির উন্মেষ হইতে পারে না। ইহা হইল ভক্তির স্বরূপগত ধর্ম্মের বা বস্তুগত শক্তির প্রভাব; সুতরাং ইহা দ্বারাও ভক্তের প্রতি ভগবানের পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হয় না। ইহা হইল—ভক্তির প্রভাবে ভক্ত-চিত্তের বৈশিষ্ট্যের ফল। এই বৈশিষ্ট্যই ভক্তের প্রতি ভগবানের আসক্তি জন্মায় এবং ভক্তের প্রতি ভগবানের এই আসক্তির নামই ভগবানের ভক্তবাৎসল্য। ভগবানের এই ভক্তবাৎসল্যকে যদি কেহ তাঁহার ভক্ত-পক্ষপাতিত্ব আখ্যা দিতে চাহেন, তাহা হইলেও ইহা দোষের কথা নহে। ভক্তবাৎসল্য হইতেছে ভগবানের একটা বিশেষ ভজনীয় গুণ। তাঁহাতে এই গুণ আছে বলিয়াই তিনি বলিয়া থাকেন—“যথা মহাস্তি ভূতানি ভূতেষু চাবেষম্। প্রবিশ্ণুত প্রবিশ্ণুনি তথা তেষু নতেষম্ ॥ (১।১।২৫-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস ।
 পরমার্থ যায় তার, হয় রসের বশ ॥ ২২৩
 বৈরাগীর কৃত্য—সদা নামসঙ্কীৰ্ত্তন ।
 শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥ ২২৪
 জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায় ।

শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ ২২৫
 আরদিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে ।
 আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে—॥ ২২৬
 ‘কি-লাগি ছাড়াইলে ঘর, না জানো উদ্দেশ ।
 কি মোর কর্তব্য প্রভু ! কর উপদেশ ॥’ ২২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সাধবো হৃদয়ং মহং সাধুনাং হৃদয়ং হনু । মদন্ততে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ (১।১।৩০-শ্লোকের টীকাদি
 দ্রষ্টব্য) । অহং ভক্তপরাধীনো হৃদয়তঃ ইব দ্বিজ । সাধুভিঃ প্রস্তুতহৃদয়ো ভক্তৈঃ ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ শ্রীভা, ৯।৪।৬৩ ॥”

২২৩। জিহ্বার লালসা—আহার্যের জন্য লালসা । পরমার্থ—অভীষ্টবস্তু, কৃষ্ণপ্রেম । রসের বশ—
 ভোজ্যরসের বশীভূত ।

আহার্যবস্তুর প্রতিই যাহার প্রবল লোভ, ঐ বস্তুতেই তাহার আবেশ জন্মে, ক্রমশঃ দৈহিক সুখের নিমিত্তই
 তাহাকে সর্বদা বিরত হইতে হয় ; এইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখের নিমিত্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর (রসের) অনুসন্ধানই তাহাকে
 ছুটাছুটি করিতে হয়, পরমার্থের অনুসন্ধান বহু দূরে সরিয়া পড়ে ।

২২৪। এই পর্যায়ে আবার বৈরাগীর কর্তব্যের কথা বলিতেছেন ।

শাক-পত্র ইত্যাদি—কেবল উদর-ভরণের নিমিত্তই বৈরাগী ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবেন না ; তিনি সর্বদা
 নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন করিবেন, আর যখন যাহা জুটে, সমুপার্জিত তাহারারাই ক্ষুধা নিবারণ করিবেন ; মাগিয়া যাচিয়াও যদি
 কিছু না জুটে, তাহা হইলে অরণ্যজাত শাক, পাতা, ফল, মূল খাইয়া জীবনধারণ করিবেন, তথাপি পরের মুখাপেক্ষী
 হইবেন না ।

২২৫। ইতি-উতি-ধায়—এখানে ওখানে ছুটাছুটি করে । শিশ্ন—সন্তান-উৎপাদক ইন্দ্রিয় ; উপস্থ ।
 শিশ্নোদর-পরায়ণ—কামুক ও পেটুক । খাওয়ার নিমিত্ত এবং স্ত্রী-সঙ্গের নিমিত্ত যাহার বলবতী বাসনা আছে,
 তাহাকে শিশ্নোদর-পরায়ণ বলে । এইরূপ ব্যক্তি কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিতে পারে না । সংসারাসক্ত জীব যত রকম
 বাসনা আছে, তন্মধ্যে ভাল খাওয়ার বাসনা এবং স্ত্রী-সঙ্গের বাসনাই প্রধান । এই দুইটি দুর্দমনীয়া বাসনার তাড়নাতেই
 জীব সংসারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে । কিন্তু কেবলমাত্র জড়দেহের সঙ্গেই এই দুইটি বাসনার সম্বন্ধ, জীবস্বরূপের
 সঙ্গে ইহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই, ভগবৎ-প্রীতির সঙ্গেও ইহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই । এই দুইটি বাসনার পরিপোষণই
 দুঃসঙ্গ, স্তবরাং আত্মবঞ্চনা । “দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম-বঞ্চনা । কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-ভক্তি বিনা অহু কামনা ॥ ২।২।৪।৭০ ॥”
 এই দুইটি বাসনা যতদিন হৃদয়ে থাকিবে, ততদিন ভক্তির রূপালাভের কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না ; “ভুক্তি-
 মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে । তাবৎ ভক্তিমুখত্বাৎ কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৫ ॥” এজন্ত
 বলা হইয়াছে, “শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ।”

২২৬। কৃত্য—কর্তব্য ।

২২৭। এই পর্যায় রঘুনাথের উক্তি । স্বরূপদামোদরের নিকটেই রঘুনাথ এই কথা কয়টি বলিলেন । পর্যায়ে
 যে “প্রভু” শব্দটি আছে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে । “প্রভু ঘরবাড়ী ছাড়াইয়া কেন আমাকে
 বাহির করিয়া আনিলেন, তাহা তো আমি জানি না । এখন আমার কর্তব্যই বা কি, তাহাও জানি না ; প্রভু কৃপা
 করিয়া আমায় কর্তব্যের উপদেশ দিউন, ইহাই প্রার্থনা ।” ইহাই রঘুনাথের উক্তির মর্ম্ম । স্বরূপের নিকট বলার
 উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন কৃপা করিয়া এই কথা কয়টি প্রভুর চরণে নিবেদন করেন ।

প্রভু-আগে কথা মাত্র না করে রঘুনাথ ।
 স্বরূপ-গোবিন্দ-দ্বারা কহায় নিজ বাত ॥ ২২৮
 প্রভু-আগে স্বরূপ নিবেদিল আরদিনে—
 রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে—॥২২৯
 ‘কি মোর কর্তব্য, মুণ্ডিঃ না জানে’ উদ্দেশ ।
 আপনি শ্রীমুখে মোর কর উপদেশ ॥ ২৩০
 হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল—

তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥ ২৩১
 সাধ্যসাধন-তত্ত্ব শিখ ইঁহাস্থানে ।
 আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে ॥ ২৩২
 তথাপি আমার আজ্ঞায় শ্রদ্ধা যদি হয় ।
 আমার এই বাক্য তবে করিহ নিশ্চয়—॥ ২৩৩
 গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে ।
 ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥ ২৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

২২৮ । স্বরূপ গোবিন্দ দ্বারা—স্বরূপদামোদরের দ্বারা এবং গোবিন্দ দ্বারা । সঙ্কোচবশতঃ রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে নিজে কোনও কথাই বলিতেন না ; প্রভুর চরণে যদি কিছু বলিবার প্রয়োজন হইত, তিনি তাহা গোবিন্দের নিকটে, অথবা স্বরূপদামোদরের নিকটে বলিতেন এবং প্রভুর চরণে তাহা নিবেদন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেন ; তাঁহারাই রঘুনাথের কথা প্রভুর চরণে জ্ঞাপন করিতেন । ৩৬।১২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২২৯ । স্বরূপদামোদর রঘুনাথের কথা শুনিলেন ; শুনিয়া একদিন রঘুনাথকে সঙ্গে করিয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—“প্রভুর চরণে রঘুনাথের একটা নিবেদন আছে ।” এই নিবেদনটী পরবর্তী পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে ।

২৩৪ । “গ্রাম্যকথা না শুনিবে” হইতে “মানসে করিবে” পর্যন্ত দুই পয়ারে রঘুনাথের প্রতি প্রভুর উপদেশ । “গ্রাম্যকথা না শুনিবে” ইত্যাদি পয়ারে ভক্তের অনুকূল বাহ্যিক আচরণের উপদেশ দিতেছেন ।

গ্রাম্যকথা—“গ্রাম্যকথা” বলিতে সাধারণতঃ দ্বীলোক-সম্বন্ধীয় বা দ্বী-সঙ্গ সম্বন্ধীয় কথাকেই বুঝায় । গ্রাম্যকথার উপলক্ষণে এখানে, যে সকল কথার সঙ্গে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুর কোনও সম্বন্ধ নাই, সে সকল কথাকেই বুঝাইতেছে । ২।২২।৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

প্রভু বলিলেন, “রঘুনাথ, কখনও গ্রাম্য-কথা শুনিবে না, কখনও গ্রাম্যকথা বলিবেও না” ; কারণ, গ্রাম্যকথা শুনিলে বা বলিলে মন ক্রমশঃ গ্রাম্যবিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে পারে, সুতরাং ভগবদ্-বহির্গুণ হইয়া পড়িতে পারে । এই উপদেশের ধ্বনি এই যে, যেখানে গেলে গ্রাম্যকথা শুন্যার সম্ভাবনা আছে, তেমন স্থানেও যাইবে না । গ্রাম্যবার্তা-ভয়ে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী কাহারও সঙ্গ করিতেন না—“গ্রাম্যবার্তাভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গহীন । ২।৪।১৭৭ ॥”

প্রভু আরও বলিলেন, “রঘুনাথ, ভাল জিনিস খাইবে না এবং ভাল কাপড় পরিবে না ।” ভাল জিনিস বলিতে এখানে সুস্বাদু উপাদেয় জিনিসকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ; আর ভাল কাপড় বলিতে বিলাসিতাশ্রিত সুন্দর বস্ত্রাদিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । ভাল জিনিস খাইতে খাইতে বা ভাল কাপড় পরিতে পরিতে যথালোভে তৃপ্তির সম্ভাবনা দূরীভূত হইয়া যায় ; ক্রমশঃ এমন একটা অভ্যাস জন্মিয়া যায়, যখন আর মন্দ খাদ্য খাইতে বা মন্দ কাপড় পরিতে ইচ্ছা হয় না । ভাল খাদ্য ও ভাল কাপড়ে আবেশ জন্মিয়া গেলে দৈহিক সুখের দিকেই মন ধাবিত হইবে, সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে মনকে নিবিষ্ট রাখা সম্ভব হইয়া উঠিবে না । ভাল খাদ্য এবং ভাল পোষাকে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বর্দ্ধিত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে ।

মহাপ্রসাদে “ভালমন্দ” বিচার-প্রসঙ্গ ।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন—সাধক ভক্ততো শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদই গ্রহণ করিয়া থাকেন ; শ্রীকৃষ্ণে উত্তম দ্রব্য নিবেদন করিলে তাহা তো মহাপ্রসাদই হয় ; মহাপ্রসাদরূপে উত্তম বস্তু আহার করিলে কিরূপে প্রত্যবায় হইতে পারে,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কিরূপে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইতে পারে ? মহাপ্রসাদ তো চিন্ময়-বস্তু । ইহার উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি উক্তির উল্লেখ করা যায় । সন্ন্যাসের পরে কাটোয়া হইতে প্রভু যখন শান্তিপু্রে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর ভিক্ষার জন্ত যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; মহাপ্রভু মনে করিয়াছিলেন, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছে—সুতরাং সমস্তই মহাপ্রসাদ । কিন্তু প্রভু বলিলেন—“সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ । ইহা থাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ ॥ ২।৩৬১ ॥” প্রভু অবশ্য জীব-শিক্ষার জন্তই ইহা বলিয়াছেন । প্রভুর এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—উপাদেয় ভোজ্য মহাপ্রসাদ হইলেও সাধকের ইন্দ্রিয়-দমনের অল্পকূল নয় । শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীও নানাবিধ উপাদেয় বস্তু গোবর্দ্ধনবিহারী শ্রীগোপালকে অর্পণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু “রাত্রিকালে ঠাকুরের করাইয়া শয়ন । পুরীগোষাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন ॥ ২।৫।৯০ ॥” অতঃকোনও উপকরণ তিনি গ্রহণ করিলেন না । পুরী-গোস্বামীর আচরণও সাধক-জীবের শিক্ষার নিমিত্ত । কিন্তু ইহার হেতু কি ? মহাপ্রসাদ-সম্বন্ধেও “ভাল না থাইবে” ব্যবস্থা কেন ? শ্রীল রঘুনাথ দাসও মহাপ্রসাদ ব্যতীত অতঃ কিছু অনিবেদিত দ্রব্য—আহার করিতেন না ।

— ইহার হেতু বোধ হয় এই । শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—মহাপ্রসাদরূপে হইলেও উপাদেয় উপকরণ ভোজন করিলে “কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ ॥” এই উক্তির ধ্বনি এই যে—ইন্দ্রিয়-স্বথের বাসনা যাঁহাদের মধ্যে সম্যক্রূপে তিরোহিত হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত উপাদেয় বস্তু গ্রহণেও তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইতে পারে, “ইতর-রাগ-বিগ্নারণ শ্রীকৃষ্ণধরামৃত” গ্রহণেও তাঁহাদের “ইন্দ্রিয়-বারণ” না হইতে পারে । ইহাতে মহাপ্রসাদের মহিমা খর্ব্বের প্রশ্ন উঠিতে পারে না । স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা ভক্তির পক্ষে মায়া ও মায়ার প্রভাব—ইন্দ্রিয়-চাক্ষু্যাদি দূরীকরণের শক্তি আছে । ভজনের প্রারম্ভেই এই ভক্তি কৃপা করিয়া সাধকের চিত্তে প্রবেশ করেন (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । কিন্তু চিত্তে প্রবেশমাত্রই চিত্তের সমস্ত মলিনতা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় না—ক্রমশঃ হয় ; প্রথমে রজস্তমঃ, তারপর সব দূরীভূত হয় (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । যে পর্য্যন্ত চিত্তে কিছু না কিছু মায়িক গুণ থাকিবে, সে পর্য্যন্তই দেহস্বথের বাসনা জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা (৩।৫।৪৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । দেহাবেশ হইতেই দেহস্বথের বাসনা জন্মে এবং দেহস্বথের বাসনাদি হইতেই অনর্থের উদ্গম । মধ্যলীলায় ২।২৩।৫ পয়ারের টীকায় দেখান হইয়াছে, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু (১।৩।২৪-২৫ শ্লোক) বলেন, জাতরতি ভক্তের পক্ষেও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভক্তের চরণে অপরাধ জন্মিবার এবং চিত্তে মুমুক্ষা জন্মিবার এবং কৃষ্ণরতি রত্যাভাসে বা অহংগ্রহোপাসনায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা আছে । জাতপ্রেম ভক্তের অনর্থ-নিবৃত্তি পূর্ণা হইলেও পুনরায় অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা থাকে । কেবল শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবা-প্রাপ্তিতেই অনর্থের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইতে পারে । ইহা হইতে অনুমিত হয়—শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবা প্রাপ্তির পূর্বপর্য্যন্ত জাতরতি—এমন কি জাতপ্রেম—ভক্তের চিত্তেও সময় সময় স্বস্বথ-বাসনা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে । এই স্বথবাসনা ভক্তের অনুষ্টিত ভক্তি-অঙ্গেও প্রতিফলিত হইতে পারে । স্বথবাসনা মায়া গুণজাত বলিয়া (৩।৫।৪৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) এই বাসনা যখন ভক্তি-অঙ্গে প্রতিফলিত হইবে, তখন সেই ভক্তিও সাময়িক ভাবে গুণীভূত হইয়া পড়িতে পারে । এই অবস্থায় ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানও ভক্তির পুষ্টি সাধন না করিয়া দুর্ভাসনারই পুষ্টি সাধন করিতে পারে । এইরূপ অনুমানের হেতু এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলিয়াছেন—“কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা । ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা ॥ নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহিংসন । লাভ-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥ সেকজল পাঞা উপশাখা বাঢ়ি যায় । শুদ্ধ হঞা মূল শাখা বাঢ়িতে না পায় ॥ ২।১৯।১৪৮-৪৯ ॥”—শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানেও অবস্থাবিশেষে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির বাসনাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । ঠিক এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদী উপাদেয় বস্তুও অবস্থাবিশেষে সাধকের ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বর্দ্ধিত করিতে পারে । স্বস্বথ-বাসনারূপ অনর্থহেতু মহাপ্রসাদের মহিমা সত্ত্বঃ প্রকাশিত হইতে পারে না ; তাই ইহাতে মহাপ্রসাদের মহিমা খর্ব্ব হওয়ার প্রশ্ন উঠিতে পারে না । আকাশ যখন ঘনঘটাচ্ছন্ন থাকে, তখন অনেক সময় সূর্য্য দেখা যায়না । এই অবস্থায় ঘনঘটা সূর্য্যের মহিমা খর্ব্ব করিয়াছে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বলা যায় না । সূর্য্যের উত্তপ্ত কিরণজালও শৈত্যগুণ-প্রধান চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া শৈত্যগুণ ধারণ করে—চন্দ্র হইতে প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণকেই আমরা চন্দ্রের কিরণ বলিয়া থাকি ; এই চন্দ্রকিরণের শীতলতা দেখিয়া যদি তাহার মূল সূর্য্যকিরণকে কেহ শীতল বলিয়া মনে করে, তাহা হইবে ভ্রান্তি এবং তাহাতেই সূর্য্যকিরণ শীতল হইয়া যাইবে না । তদ্রূপ, ভক্তির স্বাভাবিক গতি শ্রীকৃষ্ণের দিকে হইলেও তাহাতে যখন জীবের দেহাভিমুখী মায়া বা মায়িক বাসনাদি প্রতিফলিত হয়, তখন বাসনার ধর্ম্মও সাময়িক ভাবে ভক্তি-অঙ্গে প্রতিফলিত হইতে পারে । ভক্তি তখন তটস্থা হইয়া থাকেন, তটস্থা থাকিয়া গুণীভূতা ভক্তিরূপে সাধকের বাসনা-পূর্ত্তির আনুকূল্য বিধান করেন । ইহাই গোণীভক্তির স্বরূপ (২।১৯।২২-২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) । সূর্য্যরশ্মি সরল রেখাতেই গমন করে, কিন্তু তাহার অগ্র-ভাগে বক্র কোনও বস্তু ধরিলে বক্র ছায়ায় সৃষ্টি হয় ; সূর্য্যরশ্মির প্রভাবেই বক্র ছায়ায় সৃষ্টি ; কিন্তু ছায়া বক্র বলিয়া সূর্য্য-রশ্মির গতিকে বক্র বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে না । কৃষ্ণাভিমুখী ভক্তির অগ্রভাগে দেহাভিমুখী বাসনাকে ধারণ করিলে বাসনানুরূপ ফলই পাওয়া যাইবে । শ্রীকৃষ্ণও তাই বলিয়াছেন—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে স্তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

বৈষ্ণব কখনও মহাপ্রসাদ ব্যতীত অণু বস্তু গ্রহণ করেন না । মহাপ্রসাদ ভোজনই বৈষ্ণবের পক্ষে শাস্ত্রীয় বিধি । মহাপ্রসাদ হইল অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু ; চিন্ময় বস্তু অপরিমিত গ্রহণেও দেহাদির কোনওরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিতে পারে না । তথাপি কিন্তু শাস্ত্রে বৈষ্ণবের একটি লক্ষণ বলা হইয়াছে—মিতুভক্ (২।২২।৪৭) । বৈষ্ণব সর্ব্বদা পরিমিত আহার গ্রহণ করিবেন । ইহার হেতু এই । দেহে যতক্ষণ মায়ার গুণ বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ মহাপ্রসাদও পরিমাণের অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে দেহের পীড়া জন্মিতে পারে । তাই মিত-ভোজনের ব্যবস্থা ।

অথবা—হেতু অণুরূপও হইতে পারে । তাহা এই । প্রাকৃত জগতে যে সমস্ত বস্তু আছে, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামেও প্রায় যে সমস্ত বস্তু আছে । পার্থক্য এই যে—প্রাকৃত জগতের বস্তু প্রাকৃত, আর চিন্ময় ভগবদ্ধামের বস্তু চিন্ময়, অপ্রাকৃত । স্বরূপগত এই পার্থক্য সত্ত্বেও তাহাদের স্বাদাদি এক জাতীয়ই । চিনি-মিশ্রী উভয় স্থানেই মিষ্ট ; নিম্ব উভয় স্থানেই তিক্ত ; তৈতুল উভয় স্থানেই অম্ল ; লঙ্কা উভয় স্থানেই ঝাল । তাহাদের গুণাদিও এক জাতীয় হওয়ারই সম্ভাবনা ; তবে অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর গুণাদিতে শক্তি-আদির কোনও এক অপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে । ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে যে প্রাকৃত বস্তু উত্তেজক, ভগবানে নিবেদিত হইয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করিলেও তাহা উত্তেজকই থাকিবে । ভগবদ্ধামের চিন্ময় বস্তুর উত্তেজকত্ব পরিকরাদির পক্ষে ভগবৎ-সেবা বাসনার এবং ভগবৎ-সেবারই পুষ্টিবিধান করে ; তাহাদের আয়েন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনাকে উত্তেজিত করিতে পারে না ; যেহেতু, তাহাদের আয়েন্দ্রিয়-সুখ-বাসনাই নাই । প্রাকৃত জগতের সাধক-ভক্তের মধ্যে কিঞ্চিং দেহাবেশ থাকে বলিয়া চিন্ময় মহাপ্রসাদরূপ উত্তেজক বস্তুও স্থলবিশেষে আয়েন্দ্রিয়-সুখ-বাসনাকে উত্তেজিত করিতে পারে । এইরূপে, যে বস্তুর অতিভোজনে দেহের গ্লানি জন্মে, দেহাবেশ থাকিলে মহাপ্রসাদরূপে সেই বস্তুর অতিভোজনেও সাধক ভক্তের দেহের গ্লানি জন্মিতে পারে ।

উল্লিখিত আলোচনায় মহাপ্রসাদেরও অতিভোজনাदিতে অপকারিতার হেতুরূপে যাহা বলা হইল, তাহা একমাত্র অনুমানমূলক । অতিভোজনাদি যে অপকার-জনক, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন, শাস্ত্রও বলিয়াছেন ; স্মরণ্য তৎসম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না ।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—মহাপ্রসাদ সম্বন্ধেই যদি “ভাল মন্দ” বিচার করিতে হয়, দেহের পীড়াদির ভয়ে যদি মিত-ভোজনের ব্যবস্থাই দিতে হয়, তাহা হইলে “মহাপ্রসাদে বিশ্বাস” রহিল কোথায় ? উত্তর—মহাপ্রসাদে বিশ্বাস অতি উত্তম কথা । যাহার মহাপ্রসাদে বাস্তব বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র । কিন্তু ভক্ত্যুৎপাদক দৈগ্ধবশতঃ তিনিও বোধহয় মহাপ্রসাদে নিজের অকপট বিশ্বাসের কথা বিশ্বাস করিবেন না । আরও একটি কথা বিবেচ্য । মহাপ্রসাদে বিশ্বাসের বহিরাবরণের অন্তরালে নিজের ভোগলালসা লুক্কায়িত আছে কিনা,

অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে ।

। ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে ॥ ২৩৫

গৌর কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

তাহাও বিচার করিয়া দেখা দরকার । অনেক সময়ে সাধুর বেশেও গৃহে চোর প্রবেশ করিতে পারে । জাতপ্রেম ভক্তেরও যখন অনর্থোদগমের আশঙ্কা থাকে, তখন আত্মরক্ষার্থ যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বনই বাঞ্ছনীয় । সমস্ত ভোজনই মহাপ্রসাদের মর্যাদা রক্ষার একমাত্র পন্থা নহে । কণিকাগ্রহণেও মর্যাদা রক্ষিত হইতে পারে ; শ্রীল-হরিদান ঠাকুর সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন (৩১১।১২) ।

২৩৫ । এই পয়ারে রঘুনাথকে প্রভু ভজনের উপদেশ দিতেছেন । রাগানুগীয়-ভজনের যে বাহ্য ও অন্তর—এই দুইটি অঙ্গ আছে, সেই দুইটি অঙ্গের উপদেশই প্রভু দিতেছেন । সর্বদা কৃষ্ণনাম-গ্রহণের কথায় বাহ্য-সাধক-দেহের ভজনের উপদেশ এবং ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মানসিক-সেবার কথায় অন্তর-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন । ২।২২।৮৯-৯০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

শ্রীকৃষ্ণনাম বলিতে “হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ” ইত্যাদি মুখ্যতঃ সোল-নাম ব্রজ-অক্ষরের কথাই বলা হইতেছে ; ইহাই কলির তারক-ব্রহ্ম নাম ।

কিরূপে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও প্রভু বলিলেন—নিজে অমানী হইয়া এবং অপরের প্রতি মানদ হইয়া শ্রীনাম-গ্রহণ করিতে হইবে । অমানী হইয়া অর্থাৎ কাহারও নিকটে কোনওরূপ সম্মানের প্রত্যাশা না করিয়া ; সমাজে বাহারা নিতান্ত হেয়, কিম্বা কোনও কারণে নিতান্ত ঘৃণিত, এমন কি বাহারা সম্পূর্ণরূপে সাধন-ভজনহীন, তাহাদের নিকটেও কোনওরূপ সম্মান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিবে না ; কারণ, এইরূপ করিলে সম্মান-প্রাপ্তি-বিষয়ে মনের আবেশ জন্মিতে পারে, তাহাতে ভক্তির বিঘ্ন হইবে । আর, সকলকেই সম্মান করিবে, নিতান্ত হেয়, নিতান্ত নিন্দিতকর্ম্মা ব্যক্তিকেও অন্তরের সহিত সম্মান করিবে, এমন কি শৃগাল-কুকুরাদিকে পর্য্যন্ত সম্মান করিবে—কারণ, প্রত্যেকের মধ্যেই অন্তর্য্যামিরূপে শ্রীভগবান্ আছেন—“জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান ॥ ৩২০।২০ ॥” “ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুকুর অন্ত করি । দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্ত করি ॥—চৈ, ভাঃ । অন্ত্য । ওয় অঃ ।” এইরূপ করিতে পারিলেই নিজের সম্বন্ধে হেয়তাজ্ঞান আসিবে, নিজের হেয়তা-জ্ঞান না আসিলে দণ্ডমাংসর্য্যাদি ভক্তির প্রতিকূল ভাবগুলি চিত্ত হইতে দূরীভূত হইবে না—নিষ্কপট-ভজনও সম্ভব হইবে না, ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণও সম্ভব হইবে না ।

প্রশ্ন হইতে পারে, এক কৃষ্ণ-নামেরই যখন এতই গুণ যে,—“এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ । প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার । শ্বেদকম্প-পুলকাদি গদগদাশ্রুধার ॥ অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন । এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥ ১।৮।২২-২৪ ॥”—তখন আর অমানী-মানদ-আদি হওয়ার দরকার কি ? “হেলয়া শ্রদ্ধয়া বাপি” কোনও রকমে একবার কৃষ্ণ-শব্দটা উচ্চারণ করিতে পারিলেই তো হইয়া যায় । উত্তর—একথা সত্য, কিন্তু নিরপরাধ ব্যক্তির পক্ষেই একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই প্রেমোদয় সম্ভব । যে চিত্তে পূর্বসঞ্চিত অপরাধ আছে,—“কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অকুর ॥ ১।৮।২৬ ॥” অপরাধী ব্যক্তির চিত্ত হইতে অপরাধকে অপসারিত করিবার নিমিত্তই অমানী-মানদ হইয়া, তৃণাদপি স্তূনীচ হইয়া নামগ্রহণের ব্যবস্থা । অবশ্য রঘুনাথের চিত্তে যে অপরাধ ছিল, তাহা নহে—তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, তাঁহার সাধনেরই কোনও প্রয়োজন ছিলনা—জীব-শিক্ষার নিমিত্তই তাঁহার সাধন ; এবং তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া পরম-করণ শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব-সাধারণের ভজনাঙ্গের উপদেশই দিতেছেন ।

নামকীর্তনের উপলক্ষ্যে প্রভু বোধ হয় নববিধা সাধন-ভক্তির উপদেশই করিলেন । নব-বিধা সাধনভক্তির মধ্যে নাম-কীর্তনই শ্রেষ্ঠ, আবার “নববিধাভক্তি পূর্ণ হয় যাহা (নাম-সঙ্কীৰ্তন) হৈতে । ২।১৫।১০৮ ॥” তাই নাম-সঙ্কীৰ্তনকে নববিধা ভক্তির অঙ্গী বলিয়া মনে করা যায় এবং অপর ভক্তি-অঙ্গকে তাহার অঙ্গ মনে করা যায় । অঙ্গীর

এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ ।

স্বরূপের ঠাণ্ডি ইহার পাইবে বিশেষ ॥ ২৩৬

তথাহি পদ্মাবল্যাস (৩২)—

তৃণাদপি সূনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ ।

মহা প্রভু কৈল তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন ॥ ২৩৭

পুন সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে ।

অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে ॥ ২৩৮

হেনকালে আইলা সব গোঁড়ের ভক্তগণ ।

পূর্ববৎ প্রভু সভায় করিল মিলন ॥ ২৩৯

সভা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন ।

সভা লঞা কৈল প্রভু বস্ত্রভোজন ॥ ২৪০

রথযাত্রায় সভা লঞা করিল নর্তন ।

দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন ॥ ২৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

উল্লেখই অঙ্গের উল্লেখ ধনিত হয়। বাহ্য-সাধনে রঘুনাথ যে কেবল নামকীর্তনই করিয়াছেন, আর কিছু যে করেন নাই, তাহা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছিতে এবং স্বরূপদামোদরের আদেশে তিনি শ্রীগিরিধারীর সেবা করিয়াছেন, লীলাবর্ণন করিয়াছেন, শ্রীমুক্তি-দর্শনাদি, ব্রজে-বাসাদি সমস্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানই করিয়াছেন। তাই মনে হয়, নাম-সঙ্গীর্তনের উপলক্ষণে প্রভু সমস্ত ভক্তি-অঙ্গের উপদেশই করিলেন।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি—অন্তর্নিহিত দেহে সর্বদা ব্রজে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিবে; ইহা অন্তর-সাধন। ২২২।১০ পরারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩৬। বিশেষ—বিশেষ বিবরণ; কিরূপে অমানী-মানদ হওয়া যায়, কি প্রণালীতে মানসিক সেবা করিতে হয়, নামসঙ্গীর্তনের উপলক্ষণে আর কি কি ভজনাঙ্গের কথা বলা হইয়াছে ইত্যাদির বিবরণ।

শ্লোক ৩। অমর। অনুরাদি ১১৭।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৩৭ পরারের প্রথমার্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

২৩৮। অন্তরঙ্গ সেবা—অন্তঃ + অঙ্গ = অন্তরঙ্গ। হস্তপদাদি বা দেহ হইল লোকের বাহিরের অঙ্গ বা বহিরঙ্গ; আর চিত্ত হইল ভিতরের অঙ্গ বা অন্তরঙ্গ। চিত্তের যে সেবা, তাহাই হইল অন্তরঙ্গের সেবা, বা অন্তরঙ্গ-সেবা। যাহার সেবা করিতে হইবে, তাঁহার চিত্ত জানিয়া, অন্তরের ভাব বুঝিয়া যদি এমন কিছু করা যায়, যাহাতে তাঁহার চিত্তে উল্লাস জন্মিতে পারে, কিম্বা তাঁহার চিত্তস্থিত ভাবের পুষ্টিসাধন হইতে পারে, অথবা তাঁহার চিত্তে দুঃখজনক কোনও ভাব থাকিলে তাহা যাহাতে দূরীভূত হইতে পারে—তাহা হইলেই তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবা হইতে পারে।

রঘুনাথদাস স্বরূপদামোদরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন, ইহাই এই পরারার্ধে বলা হইল; তিনি কাহার অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন? শ্রীমন্মহাপ্রভুর। প্রভু যখন রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া অস্থির হইয়া পড়িতেন, তখন স্বরূপ-দামোদর তাঁহার অন্তর জানিয়া অন্তরস্থিত ভাবের অনুকূল পদাদি কীর্তন করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন; এই জাতীয় সেবা-কার্যে স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে রঘুনাথদাসও যোগ দিতেন। ১১৭।১০ পরার দ্রষ্টব্য।

২৩৯। হেন কালে—যে সময়ে রঘুনাথ প্রভুর উপদেশানুযায়ী ভজন করিতেছিলেন এবং স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবা করিতেছিলেন, সেই সময়ে। পূর্ববৎ—পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত। সভায়—সবায়; সকলকে; সমস্ত গোড়ীয় ভক্তকে। করিল মিলন—সাক্ষাৎ করিলেন; কোনও কোনও গ্রন্থে “কৈল নিমন্ত্রণ” পাঠান্তর আছে।

২৪১। করিল নর্তন—কোনও কোনও গ্রন্থে “করিল কীর্তন” পাঠান্তর আছে।

দেখি রঘুনাথের ইত্যাদি—রথ-যাত্রায় নর্তনাদিতে প্রভুর অলৌকিক ভাব-বিকার এবং মাধুর্য্য-বিকাশ দেখিয়া রঘুনাথদাস বিম্বিত হইলেন।

রঘুনাথদাস যবে সভারে মিলিল।

অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা ॥ ২৪২

শিবানন্দসেন তাঁরে কহে বিবরণ—।

তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাইল দশজন ॥ ২৪৩

তোমাকে পাঠাইতে পত্নী পাঠাইল মোরে ।

ঝাঁকরা হৈতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে ॥ ২৪৪

চারিমাস বহি ভক্তগণ গোড়ে গেল।

শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥ ২৪৫

সেই মনুষ্য শিবানন্দসেনেরে পুছিল—।

মহাপ্রভুর স্থানে এক বৈরাগী দেখিলা ? ॥ ২৪৬

গোবর্দ্ধনের পুত্র তেঁহো—নাম রঘুনাথ ।

তার পরিচয় নীলাচলে আছে তোমার সাথ ? ২৪৭

শিবানন্দ কহে—তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে ।

পরম বিখ্যাত তেঁহো, কেবা নাহি জানে ? ॥ ২৪৮

স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ ।

প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণসম ॥ ২৪৯

রাত্রিদিন করে তেঁহো নামসঙ্কীৰ্ত্তন ।

কণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ॥ ২৫০

পরম বৈরাগ্য,—নাহি ভক্ষ্য পরিধান ।

যৈছে-তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ ॥ ২৫১

দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিষা ।

সিংহদ্বারে ঠাড়া (খাড়া) হয় আহার-লাগিষা ॥ ২৫২

কেহো যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ ।

কভু উপবাস, কভু করেন চর্কণ ॥ ২৫৩

এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধনস্থানে ।

কহিল গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে ॥ ২৫৪

শুনি তার মাতা-পিতা দুঃখিত হইলা ।

পুত্রঠাঞি দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈলা ॥ ২৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

২৪৩-৪৪। কহে বিবরণ—রঘুনাথের অনুসন্ধানে তাঁহার পিতা কি কি করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত শিবানন্দসেন রঘুনাথদাসকে বলিলেন। তিনি বলিলেন—“রঘুনাথ, তোমার পিতা মনে করিয়াছিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গেই নীলাচলে যাত্রা করিয়াছ; তাই তিনি দশজন লোক আমার নিকট পাঠাইলেন; তাহাদের সঙ্গে আমার নামে একখানা পত্রও দিয়াছিলেন। তোমাকে যেন ঐ লোকদের সঙ্গে বাড়ীতে ফিরাইয়া পাঠাই, পত্রে ইহাই অনুরোধ ছিল। তাহারা ঝাঁকরা পর্যন্ত আসিয়াছিল; তোমাকে আমাদের সঙ্গে না পাইয়া তাহারা দেশে ফিরিয়া গিয়াছে।”

২৪৫। চারিমাস বহি—নীলাচলে চারিমাস থাকিয়া। শুনি—নীলাচল হইতে ভক্তগণের দেশে ফিরিয়া আসার সংবাদ শুনিয়া। মনুষ্য পাঠাইলা—শিবানন্দের নিকটে লোক পাঠাইলেন, রঘুনাথের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত।

২৪৬। পুছিল—জিজ্ঞাসা করিল।

“মহাপ্রভুর স্থানে” হইতে “তোমাদের সাথ” পর্যন্ত কয়টি কথা রঘুনাথের পিতার প্রেরিত লোক শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

২৫৩। কভু উপবাস ইত্যাদি—রঘুনাথ যে দিন কাহারও নিকটে কিছু প্রসাদ পাইতেন, সেইদিন তাহা আহার করিতেন। যেদিন কিছু পাইতেন না, সেই দিন উপবাসই করিতেন। যেদিন প্রসাদান্ন না পাইয়া ছোলা আদি সামান্য কিছু পাইতেন, সেইদিন তাহাই চর্কণ করিয়া খাইতেন—সকল অবস্থাতেই তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের কর্তব্য—ভজন করিতেন।

২৫৪। গোবর্দ্ধনস্থানে—রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন দাসের নিকটে।

২৫৫। দ্রব্য—খাওয়ার জিনিস, পরিবার কাপড়াদি এবং টাকা-পয়সাদি। মনুষ্য—রঘুনাথের পরিচর্য্যার নিমিত্ত লোক।

চারিশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ ।

শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ ॥ ২৫৬

শিবানন্দ কহে—তুমি সব যাইতে নারিবা ।

আমি যবে যাই তবে সঙ্গেই চলিবা ॥ ২৫৭

এবে ঘর বাহ, যবে আমি সব চলিব ।

তবে তোমাসভাকারে সঙ্গে লঞা যাব ॥ ২৫৮

এই ত প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপুর ।

রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে লিখিয়াছে প্রচুর ॥ ২৫৯

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (১০।৩,৪)—

আচার্য্যো যদ্বন্দনঃ স্মধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-

শুচ্ছিয়ো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্ ।

শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপাশ্রুগো

বৈরাগ্যৈকনিধিনকশ্চ বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্ ॥৪

যঃ সৰ্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা

সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকুষ্ঠপচ্যা ।

যত্রায়মারোপণ-তুল্যকালং

তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যাম্ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

বাসুদেবদত্তশ্চ প্রিয়ঃ । শ্রীচৈতন্যশ্চ কৃপাতিরেকেন সততমবিরতং স্নিগ্ধঃ উদ্বেষগরহিতঃ । নীলাচলে তিষ্ঠতঃ স্থিতিং কুর্ষতঃ কশ্চ জনশ্চ ন বিদিতঃ ন জ্ঞাতঃ । চক্রবর্তী । ৪

যো রঘুনাথদাসঃ সৰ্বলোকৈক-মনোভিরুচ্যা হেতুভূতয়া কাচিদনির্কচনীয়া অকুষ্ঠপচ্যা সৌভাগ্যভূরিত্যি সম্বন্ধঃ । সৰ্বলোকানাং যদৈকং মন একমত্যং তেনাভিরুচি স্তয়া সৌভাগ্যবিশেষভূঃ সা । কৃষাদিকং বিনা যত্র শস্ত্রাভ্যাংপত্তিঃ সা অকুষ্ঠপচ্যা । যস্তাং শ্রীরঘুনাথদাসভূবি তস্মিন্ প্রসিদ্ধে শ্রীকৃষ্ণে যঃ প্রেনা স এব শাখী বৃক্ষঃ সমারোপণতুল্যকালং তস্মিন্নেব কালে ফলবান্ ভবতীতি শেষঃ । কিংভূতঃ অতুল্যঃ তুলনারহিতঃ । চক্রবর্তী । ৫

গৌর-কৃপা-ভরদ্বিজী টীকা ।

২৫৬। শিবানন্দের ঠাঞি—নীলাচলে যাওয়ার পথের সন্ধান জানিবার নিমিত্ত শিবানন্দের নিকটে পাঠাইলেন ।

২৫৯। শ্রীল কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক হইতে পরবর্তী দুইটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়া পূর্ববর্তী পয়ারসমূহে উল্লিখিত উক্তির যাথার্থ্য দেখাইতেছেন ।

শ্লো। ৪। অর্থঃ । স্মধুরঃ (স্মধুর-স্বভাব) শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ (বাসুদেবদত্তের প্রিয়পাত্র) আচার্য্যঃ যদ্বন্দনঃ (যদ্বন্দন আচার্য্য) ; তচ্ছিয়ঃ (তাঁহার শিষ্য) ইত্যধিগুণঃ (ইহাতে অধিগতগুণ—বিবিধ গুণের আকর) মাদৃশাং (আমাদের) প্রাণাধিকঃ (প্রাণাধিক) শ্রীচৈতন্য-কৃপাতিরেক-সতত-স্নিগ্ধঃ (শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যধিক কৃপালাভ-হেতু স্নিগ্ধ—উদ্বেষগশূ) স্বরূপপ্রিয়ঃ (স্বরূপদামোদরের প্রিয়) বৈরাগ্যৈকনিধিঃ (বৈরাগ্যের সাগরতুল্য) রঘুনাথঃ (রঘুনাথ) নীলাচলে (নীলাচলে) তিষ্ঠতঃ (অবস্থানকারী) কশ্চ (কাহার) ন বিদিতঃ (বিদিত নহে) ?

অনুবাদ । মধুর-স্বভাব যদ্বন্দন-আচার্য্য বাসুদেবদত্তের প্রিয়পাত্র । তাঁহার (যদ্বন্দন-আচার্য্যের) শিষ্য বিবিধ গুণের আকর রঘুনাথদাস আমাদের প্রাণাধিক । যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অত্যধিক কৃপালাভহেতু সতত স্নিগ্ধ (উদ্বেষগশূ), যিনি স্বরূপদামোদরের প্রিয় এবং যিনি বৈরাগ্যের সাগরতুল্য—সেই রঘুনাথকে জানেনা, এমন লোক নীলাচলে কে আছেন ? ৪

শ্লো। ৫। অর্থঃ । যঃ (যিনি—যে রঘুনাথদাস) সৰ্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা (সকললোকের মনের সাধারণ একমাত্র প্রীতির বিষয় বলিয়া) কাচিৎ (কোনও এক অনির্কচনীয়া) অকুষ্ঠপচ্যা (অকুষ্ঠপচ্যা—কর্ষণাদি ব্যতীতই শস্ত্রোৎপাদনে সমর্থ) সৌভাগ্যভূঃ (সৌভাগ্যভূমির তুল্য হইয়াছেন), যত্র (যাহাতে—যে সৌভাগ্যভূমিতে) অয়ং (এই) তৎপ্রেমশাখী (কৃষ্ণপ্রেমতরু) আরোপণ-তুল্যকালং (রোপণ-সম-কালেই—রোপণমাত্রেরই) অতুল্যং (তুলনারহিতভাবে) ফলবান্ (ফলবান্ হইয়া থাকে) ।

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল ।
কর্ণপুর সেইরূপ শ্লোক বর্ণিল ॥ ২৬০
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে ।
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে ॥ ২৬১
সেই বিপ্র ভৃত্য চারিশত মুদ্রা লঞা ।

নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া ॥ ২৬২
রঘুনাথ দাস অঙ্গীকার না করিলা ।
দ্রব্য লঞা তিন জন তাহাঁই রহিলা ॥ ২৬৩
তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন ।
মাসে দুইদিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ২৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অনুবাদ । যে রঘুনাথদাস সকল লোকের মনের সাধারণ প্রীতির বিষয় বলিয়া কোনও এক অনির্করণীয় অকৃষ্টপচ্যা (কর্ষণাদি ব্যতীতই শস্তোৎপাদনে সমর্থ) সৌভাগ্যভূমির তুল্য হইয়াছেন—যে সৌভাগ্যভূমিতে (রঘুনাথদাসে) কৃষ্ণ-প্রেম-তরু রোপণ-সমকালেই অল্পপম ফল ধারণ করিয়াছে । ৫

সর্বলোকৈক্যমনোভিরুচ্যা— সর্ব (সমস্ত) লোকের একমনের (একতাপ্রাপ্ত মনসমূহের—সর্ববাদি-সম্মতরূপে) যে অভিরুচি (প্রীতি) তদ্বৎ; একবাক্যে সকলেই প্রীতির পাত্র মনে করে বলিয়া । **অকৃষ্টপচ্যা—** কর্ষণাদি (চাষ-দেওয়া আদি) দ্বারা যাহাতে ফসল জন্মাইতে হয়, তাহাকে বলে কৃষ্টপচ্যা ভূমি; যাহা কৃষ্টপচ্যা নহে—কর্ষণাদি ব্যতীতই কেবলমাত্র বীজ ফেলিয়া রাখিলেই যাহাতে ফসল জন্মে, তাহাকে বলে অকৃষ্টপচ্যা ভূমি; রঘুনাথদাস ছিলেন ঈদৃশী অকৃষ্টপচ্যা **সৌভাগ্যভূঃ**—সৌভাগ্যভূমির তুল্য; সৌভাগ্যই ফলে যে ভূমিতে, যে ভূমিতে কেবল কৃষ্ণপ্রেমরূপ সৌভাগ্যই জন্মে, তাহাকে সৌভাগ্যভূমি বলা যায়; রঘুনাথদাস ছিলেন এইরূপ এক অপূর্ব অকৃষ্টপচ্যা সৌভাগ্যভূমির তুল্য; সাধারণ কৃষিকার্য্যাদি ব্যতীতই তাহাতে সৌভাগ্যরূপ ফসল ফলিত; তাৎপৰ্য্য এই যে—কৃষ্ণপ্রেম লাভ করার নিমিত্ত তাঁহাকে সাধন করিতে হয় নাই; প্রেমের বীজ তাঁহার চিত্তে পতিত হওয়া মাত্রেই তাহা ফলবান্ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে—যত্র—যে সৌভাগ্যভূমিতে, যে রঘুনাথদাসে **তৎপ্রেমশাখী**—সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-সম্বন্ধে শাখী (কল্লতরু), কৃষ্ণপ্রেমকল্লতরু, **আরোপণতুল্যকালং**—রোপণসময়েই, রোপণমাত্রেই ফলবান্ হইয়াছে । কৃষ্ণপ্রেমের বীজটি কি? মহৎকৃপা বা ভগবৎ-কৃপার আশ্রিত ভজনাকাজ্ঞা (২।১৯।১৩৩); রঘুনাথদাস উভয়ের কৃপাই পাইয়াছেন; শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা এবং স্বরূপদামোদরের কৃপা—উভয়ই রঘুনাথের ভজনাকাজ্ঞাকে তৎক্ষণাৎ ফলবতী করিয়াছে । এইভাবে কৃপাপ্রাপ্তি মাত্রেই যে প্রেমলাভ, ইহা একটা **অতুল্য**—তুলনারহিত ব্যাপার; আর কাহারও ভাগ্যে এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায় না ।

২৫৯-পয়সারোক্তির প্রমাণ এই দুই শ্লোক ।

“যত্রায়মারোপণতুল্যকালম্”—স্থলে “যত্রাং সমারোপণতুল্যকালম্”—পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ—একই ।

২৬০ । হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত লোকের নিকটে শিবানন্দসেন যাহা বলিয়াছেন, ঠিক তাহাই কবি কর্ণপুর তাঁহার গ্রন্থে শ্লোকাকারে লিখিয়া রাখিয়াছেন ।

২৬১ । **বর্ষান্তরে**—অল্প বর্ষে; পরবর্তী বৎসরে । **রঘুনাথের সেবক বিপ্র**—রঘুনাথের পরিচর্য্যার নিমিত্ত তাঁহার পিতা-কর্তৃক প্রেরিত দুইজন সেবক এবং একজন ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ বোধ হয় রঘুনাথের জ্ঞাত পাক করিবার উদ্দেশ্যে ।

২৬২ । **সেই বিপ্র ভৃত্য**—সেই ব্রাহ্মণ এবং সেবকদ্বয় । **চারিশত মুদ্রা**—চারিশত টাকা ।

২৬৩ । রঘুনাথ পিতৃপ্রেরিত টাকাও গ্রহণ করিলেন না এবং সেবক ও বিপ্রের সেবাও গ্রহণ করিলেন না । টাকা-পয়সাদি লইয়া তাঁহার তিনজন নীলাচলেই অপেক্ষা করিতে লাগিল, দেশে ফিরিয়া আসিল না ।

২৬৪-৬৫ । শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করাইবার নিমিত্ত রঘুনাথের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার মত কপর্দকশূন্য লোকের পক্ষে এই ইচ্ছা পূর্ণ করার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না; তিনি

তুই নিমন্ত্রণে লাগে কোড়ি অষ্টপণ।

ব্রাহ্মণ-ভৃত্য-ঠাঞ করে এতেক গ্রহণ ॥ ২৬৫

এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ তুই কৈল।

পাছে নিমন্ত্রণ রঘুনাথ ছাড়ি দিল ॥ ২৬৬

মাস-তুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।

স্বরূপে পুছিল তবে শচীর নন্দন— ॥ ২৬৭

রঘু কেনে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল ?।

স্বরূপ কহে—মনে কিছু বিচার করিল ॥ ২৬৮

‘বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।

প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন ॥ ২৬৯

মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নিশ্চল।

এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল ॥ ২৭০

উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।

না মানিলে দুঃখী হৈবে এই মূঢ়জন ॥ ২৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিজেই যে ভিক্ষা করিয়া খায়েন। এক্ষণে, পিতা কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন দেখিয়া, তিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি প্রতিমাসে দুইদিন করিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলেন; দুইদিনের নিমন্ত্রণে প্রভুর নিমিত্ত যে মহাপ্রসাদ কিনিতে হয়, তাহাতে আটগুণা কড়ি (দুই পয়সারও কম) লাগিত। গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যের নিকট হইতে রঘুনাথ মাসে আটগুণা কড়ি মাত্র গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু নিজের অল্প একটি কড়িও না।

২৬৬। এইমত—মাসে দুইদিন করিয়া। বর্ষ তুই—দুই বৎসর। পাছে—দুই বৎসর পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করার পরে।

২৬৭। মাস তুই ইত্যাদি—দুই বৎসর অতীত হইয়া যাওয়ার পরে যখন দুই মাস অতীত হইয়া গেল, এই দুই মাসের মধ্যে একদিনও যখন প্রভু রঘুনাথের নিমন্ত্রণ পাইলেন না, তখন একদিন প্রভু স্বরূপদামোদরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

২৬৮। “রঘু কেনে” ইত্যাদি—ইহা প্রভুর উক্তি।

স্বরূপ কহে ইত্যাদি—প্রভুর কথা শুনিয়া স্বরূপদামোদর বলিলেন,—“প্রভু, রঘুনাথের মনে একটি বিচার উপস্থিত হওয়ায় নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া দিয়াছে।” বিচারটী পরবর্তী তিন পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

২৬৯-৭১। “বিষয়ীর দ্রব্য” হইতে “এই মূঢ়জন” পর্যন্ত তিন পয়ারে রঘুনাথের বিচার। রঘুনাথ ভাবিলেন—“আমি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেছি সত্য, কিন্তু আমি জানি, এই নিমন্ত্রণে প্রভুর মন প্রসন্ন হয় না; কারণ, আমি বিষয়ীর অর্থদ্বারাই প্রভুর নিমিত্ত মহাপ্রসাদ ক্রয় করি। যদিও ইহা আমার পিতার অর্থ, তথাপি ইহাতে প্রভুর প্রীতির সম্ভাবনা নাই; কারণ, আমার পিতা-জ্যেষ্ঠা সঙ্কল্পে স্বয়ং প্রভুই বলিয়াছেন—তঁাহারা “বিষয়-বিষ্ঠা-গর্তের কীড়া। স্তব্ধ করি মানে বিষয়ের মহাপীড়া ॥ ৩৬।১২৫ ॥” তঁাহারা আমার পূজনীয়, আমি তঁাহাদের প্রতি বা তঁাহাদের অর্থের প্রতি কোনওরূপ অশ্রদ্ধা দেখাইতে পারি না সত্য; কিন্তু প্রভু যদি তাতে প্রীত না হয়েন, তাহা হইলে কেবল তঁাহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা-বশতঃ তঁাহাদের অর্থে প্রভুর অপ্রীতিকর কাণ্ড করিবার আমার কি অধিকার আছে? প্রভুর প্রীতি-বিধাংই আমার মুখ্য কৰ্ম, পিতা-জ্যেষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন গৌণকৰ্ম; তঁাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার হানি-ভয়ে যদি আমি তঁাহাদেরই অর্থে প্রভুর নিমন্ত্রণ করি, তবে প্রভুও তাতে প্রীত হইবেন না; সুতরাং তাতে তঁাহাদেরও অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। ইহা আমার বাহ্যিক শ্রদ্ধা মাত্র, তঁাহাদের যাতে অনিষ্ট না হয়, আর প্রভুরও যাতে অপ্রীতি না হয়, তাহা করাই আমার কর্তব্য, তাহাতেই পিতা-জ্যেষ্ঠার প্রতি আমার বাস্তবিক শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে। এই অর্থদ্বারা আর প্রভুর নিমন্ত্রণ করিব না। বিশেষতঃ, প্রভুর নিমন্ত্রণের নিমিত্ত এই অর্থ গ্রহণ করিতে আমার চিত্তেরও প্রসন্নতা জন্মে না, ইহা আমি নিজেই অনুভব করিতেছি। যে কার্যে আমার নিজেরই প্রসন্নতা নাই, সেই কার্যদ্বারা প্রভুর সেবা করিতে গেলে প্রভুই বা কিরূপে প্রসন্ন হইতে পারেন? এখন দেখিতেছি, এইরূপ নিমন্ত্রণে

এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল ।

শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল—॥ ২৭২

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন ।

মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ ২৭৩

বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস-নিমন্ত্রণ ।

দাতা ভোক্তা দোহার মলিন হয় মন ॥ ২৭৪

ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল ।

ভাল হৈল, জানিয়া আপনি ছাড়ি দিল ॥ ২৭৫

কথোদিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল ।

ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল ॥ ২৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কেবল আমার প্রতিষ্ঠামাত্রই লাভ হইতেছে—“রঘুনাথ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাপ্রসাদ দেয়”—লোকের নিকটে এইরূপ একটি সুখ্যাতিমাত্রই আমার লাভ হইতেছে ; এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও লাভ দেখিতেছি না । আমি নিতান্তই মূর্থ, নিতান্তই মোহাক্র; তাই এতদিন এই তথ্যটী বুঝিতে পারি নাই ; আর পরম করণ প্রভুও কেবল আমারই অহুরোধে,—পাছে আমি মনে দুঃখ পাই, ইহা মনে করিয়াই আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছেন ; ইহাতে বাস্তবিকই তাঁহার মনে প্রীতি জন্মে না ।”

২৭২ । স্বরূপদামোদর বলিলেন, “প্রভু, এইরূপ বিচার করিয়া রঘুনাথ তোমার নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া দিয়াছে ।”

শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইলেন, তাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন ।

২৭৩ । “বিষয়ীর অন্ন” হইতে “আপনি ছাড়ি দিল” পর্য্যন্ত তিন পয়ারে প্রভুর উক্তি । প্রভু বলিলেন—“বিষয়াসক্ত ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিলে চিত্তে মলিনতা জন্মে । মলিনচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি স্মুরিত হয় না ।” বাস্তবিক সন্দোজ্জল চিত্ত ব্যতীত অচুচিত্তে গুহ্মসন্ধাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি স্মুরিত হইতে পারে না ।

বিষয়ী—বিষয়াসক্ত ব্যক্তি ।

২৭৪ । বিষয়ীর অন্নে চিত্ত মিলন হয় কেন, তাহাই প্রভু এই পয়ারে বলিতেছেন ।

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্ত সর্বদাই দম্ভ-অহঙ্কারাদি রজোগুণ-সম্মত ভাব-সমূহে পরিপূর্ণ থাকে ; তাহাদের চিত্তস্থিত ভাবসমূহ তাহাদের জিনিসেও সংক্রমিত হইয়া ঐ জিনিসকে দূষিত করিয়া ফেলে । সুতরাং ঐ দূষিত জিনিস যিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার চিত্তও মলিন হইয়া পড়ে । আর, বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যাহা কিছু দান করে, তাহাই সাধারণতঃ দম্ভ-অহঙ্কারাদি রজোগুণ-সম্মত ভাবের দ্বারা, অন্ততঃ প্রতিষ্ঠার লোভের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই দান করিয়া থাকে ; সুতরাং ঐরূপ দানে দাতার চিত্তে রজোগুণোদ্ভূত ভাবের মলিনতা জন্মিয়া থাকে । তাই বলা হইয়াছে, বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে দাতা ও ভোক্তা উভয়ের চিত্তই মলিন হইয়া যায় ।

শ্রীশ্রীতত্ত্বমাল-গ্রন্থের ষোড়শ-মালায় শ্রীল কইদাস ঠাকুরের চরিত্র-বর্ণন-উপলক্ষে তাঁহার পূর্বজন্মের একটা কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে ; বিষয়ীর অন্ন গ্রহণের অপকারিতা সম্বন্ধে ঐ কাহিনীটী দ্রষ্টব্য ।

রাজস নিমন্ত্রণ—প্রাকৃত-রজোগুণের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া (অর্থাৎ দম্ভ-অহঙ্কারাদি বা প্রতিষ্ঠা-লোভাদি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া) যে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাহাই রাজস-নিমন্ত্রণ । “এই লোকটীকে নিমন্ত্রণ করিলে লোকে আমার প্রশংসা করিবে, অথবা এই লোকটী নিতান্ত দরিদ্র, খাইতে পায় না, আমি ধনী, আমি ইহাকে না খাওয়াইলে কে খাওয়াইবে” ইত্যাদি ভাবের বশীভূত হইয়া যে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাহাই রাজস-নিমন্ত্রণ ।

২৭৫ । এই পয়ারও প্রভুর উক্তি ।

ইহার সঙ্কোচে—ইহার (রঘুনাথের) সম্বন্ধে সঙ্কোচ বশতঃ ; আমি যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করি, তাহা হইলে রঘুনাথের মনে দুঃখ হইবে, ইহা মনে করিয়া ।

নিল—নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম ।

২৭৬ । পূর্বে বলা হইয়াছে, মহাপ্রভুর বামায় গোবিন্দের নিকট হইতে পাঁচদিন মাত্র প্রসাদ পাইয়া রঘুনাথ

গোবিন্দ-পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপে—

রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাড়া না হয় সিংহদ্বারে ? ॥ ২৭৭

স্বরূপে কহে—সিংহদ্বারে দুঃখানুভবিয়া ।

ছত্রে বাই মাগি খায়-মধ্যাহ্নকালে যাঞা ॥ ২৭৮

প্রভু কহে—ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার ।

সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার ॥ ২৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

আর সেখানে যাইতেন না, রাত্রি দশ দণ্ডের পরে শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইতেন । কিছুকাল এইরূপ দাঁড়াইয়া, রঘুনাথ তাহাও ছাড়িয়া দিলেন ; ইহার পর হইতে আর ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইতেন না, ছত্রে বাইয়া মাগিয়া খাইতেন ।

ছত্র—দশ-দণ্ডের অপভ্রংশ । যেখানে গরীব-দুঃখী-দিগকে অন্ন বিতরণ করা হয়, তাহাকে ছত্র বলে । নীলাচলের ছত্র-সমূহে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয় ।

২৭৭ । প্রভু গোবিন্দের নিকট শুনিলেন যে, রঘুনাথ ছত্রে মাগিয়া খাইতেছেন । শুনিয়া একদিন স্বরূপদামোদরকে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—“সত্যই কি রঘুনাথ এখন আর ভিক্ষার জন্ত সিংহদ্বারে দাঁড়ায় না ?”

গোবিন্দের কথা যে প্রভু অবিশ্বাস করিয়াছেন তাহা নহে । তথাপি, রঘুনাথের আচরণ যে সঙ্গতই হইয়াছে, ইহা বলিবার উদ্দেশ্যে বক্তব্য বিষয়টী উত্থাপনের স্বচনাস্বরূপেই প্রভু আবার স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।

অথবা, রঘুনাথ কি আর মোটেই সিংহদ্বারে দাঁড়ায় না, না কি যে দিন সিংহদ্বারে কিছু মিলে না, সেই দিনই ছত্রে বাইয়া মাগিয়া খায়, ইহা নিশ্চিত-রূপে জানিবার নিমিত্তই প্রভু স্বরূপের নিকটে কথাটির উত্থাপন করিলেন ।

২৭৮ । এই পয়ার স্বরূপের উক্তি ।

দুঃখানুভবিয়া—দুঃখ অনুভব করিয়া ।

প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে স্বরূপ বলিলেন—“ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইলে রঘুনাথের অত্যন্ত দুঃখ হয় ; তাই এখন আর সিংহদ্বারে দাঁড়ায় না, মধ্যাহ্ন-সময়ে ছত্রে বাইয়া প্রসাদ মাগিয়া খায় ।”

প্রশ্ন হইতে পারে, সিংহদ্বারে রঘুনাথের কিসের জন্ত দুঃখ জন্মে ? সকল দিন প্রসাদ মিলে না বলিয়াই কি দুঃখ ? কখনও উপবাসী থাকিতে হয়, কখনও বা শুকনা চানা-আদি চিবাইয়া দিন কাটাইতে হয় বলিয়াই কি দুঃখ ? “কভু উপবাস, কভু করয়ে চৰ্কণ ॥” উত্তর—কভু উপবাস, কভু চৰ্কণ করিতে হয় বলিয়া রঘুনাথের দুঃখ হয় নাই । সিংহদ্বারে ভিক্ষালাভের নিমিত্ত দাঁড়াইলে মনের একটু চঞ্চলতা আসে বলিয়া এবং তজ্জন্ত ভজনের বিঘ্ন হয় বলিয়াই দুঃখ । কিরূপে মনের চঞ্চলতা জন্মে, তাহা পরবর্তী পয়ারে ও সংস্কৃত-উক্তিতে প্রভুই বলিয়াছেন ।

২৭৯ । **সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি**—ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকা, বেশ্যার আচরণের তুল্য (বেশ্যার আচরণের মত ঘৃণিত ও পাপজনক নহে ; বেশ্যার আচরণের তুল্য চিত্তের চঞ্চলতাজনক) ।

বেশ্যা অর্থের লোভে রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া থাকে ; উদ্দেশ্য, তাহাকে দেখিয়া তাহার সঙ্গলাভের আশায় কোনও দুষ্টচরিত্র লোক তাহার গৃহে আসিবে, তাহাকে কিছু অর্থ দিবে । রাস্তায় কোনও বিলাসী লোককে আসিতে দেখিলে বেশ্যা তাহার প্রতিই দৃষ্টি রাখে, মনে করে, এই লোকটী নিশ্চয়ই আমার গৃহে আসিবে । সে যখন চলিয়া যায়, তখন মনে করে, “লোকটী তো আসিল না ; অচ্ছা আর একজন আসিতে পারে ।” এইরূপে যত লোককেই বেশ্যাটী দেখিতে পায়, সকলের সম্বন্ধেই তাহার মনে এইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইতে থাকে । ইহাই তাহার চিত্ত-চাঞ্চল্যের হেতু ।

ভিক্ষার্থী হইয়া যিনি সিংহদ্বারে দাঁড়ান, তাহার চিত্তেও এইরূপ আন্দোলন হওয়ার সম্ভাবনা আছে । সমস্ত দিনের উপবাসের পরে মধ্য-রাত্রিতে যখন কোনও নিক্ষিপ্ত বৈষ্ণব সিংহদ্বারে দাঁড়ান, তখন কোনও ব্যক্তিকে মন্দির হইতে আসিতে দেখিলে তিনি মনে করিতে পারেন, “এই ভক্তটী আমাকে কিছু প্রসাদ দিতে পারেন” ; তিনি যখন

তথাহি—

কিমর্থম্ ?—অয়মাগচ্ছতি, অয়ং দাশ্রুতি,
অনেন ন দত্তম্, অয়মপরঃ সমেত্যয়ং দাশ্রুতি,
অনেনাপি ন দত্তমচ্ছঃ সমেষুতি স দাশ্রুতি ॥ ৬
ইত্যাদি ।

ছত্রে ষাই যথালভ উদর-ভরণ ।

মনঃকথা নাহি, স্তখে কৃষ্ণসঙ্কীৰ্তন ॥ ২৮০

এত বলি পুন তাঁরে প্রসাদ করিল ।

গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিল ॥ ২৮১

শঙ্করারণ্য সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা ।

তাহাঁ হৈতে সেই শিলা-মালা লঞা গেলা ॥ ৮২

পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধনের শিলা ।

দুইবস্ত্র মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥ ২৮৩

দুই অপূর্ব বস্ত্র পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা ।

স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা ॥ ২৮৪

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কিছু না দিয়াই হয়তো চলিয়া গেলেন, তখন ভিক্ষার্থী মনে করিতে পারেন, “ইনি তো দিলেন না; আচ্ছা অপর কেহ অবশ্যই দিবেন।” এইরূপে যত জন আসেন, সকলের সম্বন্ধেই এই জাতীয় আন্দোলন মনের মধ্যে চলিতে থাকে। ইহাতেই চিত্ত-চাঞ্চল্য। আর যতক্ষণ কোনও লোক সম্বন্ধে এইরূপ আন্দোলন মনের মধ্যে চলিতে থাকে, ততক্ষণ একান্তভাবে শ্রীনাম-গ্রহণাদিও সম্ভব হয় না।

শ্লো। ৬। অময়। অময় সহজ ।

অনুবাদ। বেণী দ্বারে দাঁড়াইয়া মনে মনে ভাবে—“এই ব্যক্তি আসিতেছে, এই ব্যক্তি (আমাকে ধন) দান করিবে, এই ব্যক্তি (আমাকে ধন) দান করিল না, এই অপর একজন আসিতেছে, এ-ই (আমাকে ধন) দিবে, এইব্যক্তিও (ধন) দিল না, অত একজন আসিবে, সে (আমাকে ধন) দিবে।” ৬

২৭২-পর্যায়োক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

২৮০। এই পরায়ণ প্রভুর উক্তি। ছত্রে মাগিয়া থাইতে গেলে মনের মধ্যে এইরূপ আন্দোলন জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। সেখানে গেলে কিছু না কিছু পাওয়া যাইবেই; আর যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাতেই নিশ্চিন্ত বৈষ্ণব উদর-জালা নিবারণ করিয়া মনের স্তখে শ্রীনাম-কীর্তন করিতে পারেন।

মনঃকথা—মনে মনে কথা বলা; “এই ভক্তটী আমাকে কিছু দিতে পারেন; না, ইনি দিলেন না, ঐ যে ভক্তটী আসিতেছেন, উনি হয়ত কিছু দিবেন”—ইত্যাদিরূপ চিন্তাজনিত মানসিক আন্দোলন। ছত্রে এসব মানসিক আন্দোলনের সম্ভাবনা নাই।

২৮১। তাঁরে—রঘুনাথদাসকে। প্রসাদ করিল—(প্রভু) অনুগ্রহ করিলেন। কি অনুগ্রহ করিলেন? তাহাকে “গোবর্দ্ধনের শিলা ও গুঞ্জামালা” দিলেন। গোবর্দ্ধনের শিলা—গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের শিলাখণ্ড; শ্রীগিরিদ্বারী-বিগ্রহ। গুঞ্জামালা—গুঞ্জা (কাইচ বা কুঁচ) ফলের মালা।

২৮২। গোবর্দ্ধনের শিলা এবং গুঞ্জামালা প্রভু কোথায় পাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন। শঙ্করারণ্য-সরস্বতী শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; আসিবার সময়ে শিলা ও মালা শ্রীবৃন্দাবন হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং প্রভুকে দিয়াছিলেন।

“শঙ্করারণ্য”-স্থলে “শঙ্করানন্দ”-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

২৮৩। পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা—গুজাফল-সমূহকে পাশাপাশি গাঁথিয়া এই মালা তৈয়ার করা হইয়াছিল।

২৮৪। শিলা-মালা লইয়া প্রভু কি করিয়াছিলেন, তাহাই চারি পর্যায়ে বলা হইতেছে।

দুই অপূর্ব বস্ত্র—গোবর্দ্ধনের শিলা এবং গুঞ্জামালা।

গোবর্দ্ধনের শিলা কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে ।
কভু নাসায় আঁণ লয় কভু লয় শিরে ॥ ২৮৫
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর ।
শিলাকে কহেন প্রভু ‘কৃষ্ণ-কলেবর’ ॥ ২৮৬

এইমত তিন বৎসর শিলা-মালা ধরিল ।
তুষ্ট হঞা শিলা-মালা রঘুনাথে দিল ॥ ২৮৭
প্রভু কহে—সেই শিলা ‘কৃষ্ণের বিগ্রহ’ ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥ ২৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

গিরিরাজ-শ্রীগোবর্দ্ধনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অশেষবিধ লীলার মধুময়ী স্মৃতি বিজড়িত । বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং একরূপে শ্রীগোবর্দ্ধন-স্বরূপে পূজোপকরণাদি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । গিরিরাজের তটদেশে সখাগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ-লীলা করিতেন ; গোবর্দ্ধনজাত ফল-মূলাদি সখাগণের সঙ্গে আচ্ছাদের সহিত ভোজন করিতেন । এইস্থানে সুদৃশ্য ও সুগন্ধি পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে কতভাবে সাজাইতেন ; নিজেরাও সাজিতেন ; সুগন্ধি ফুলের ও গুঞ্জাফুলের মালা গাঁথিয়া প্রাণ-কানাইকে পরাইতেন, নিজেরাও পরিতেন । গিরিরাজের সীমান্তস্থিত শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্রামকুণ্ডে সখীমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীভামুনন্দিনীর সহিত নাগরেন্দ্রশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ কতই না মধুর-লীলা করিয়াছেন ; গিরিরাজের নির্জন গুহা-প্রদেশে তাঁহারা কত কত রহোলীলা সম্পাদন করিয়াছেন । রসিকেন্দ্র-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজস্থিত পুষ্পোদ্যান হইতে কুমুম-চয়ন করিয়া কতই না মোহনসাজে প্রাণেশ্বরীকে সাজাইয়াছেন ; আবার সখীগণ-সমভি-ব্যাহারে প্রাণেশ্বরীও কতই না মোহনসাজে স্বীয় প্রাণবল্লভকে সাজাইয়াছেন—শ্বেত-গুঞ্জামালায় সখীগণ কতই না সাধে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে সাজাইয়াছেন ; আবার ব্রজেন্দ্রনন্দনও কতই না সাধে প্রেয়সী-শিরোমণি ভামুনন্দিনীর পীনোন্নত বক্ষঃস্থলে সযত্ন-গ্রথিত রক্ত-গুঞ্জাহার পরাইয়া নিজেকে ধৃত মনে করিতেন । এই সমস্ত কারণেই গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে অতি অপূর্ব বস্তু বলিয়া মনে হইয়াছিল ।

স্মরণের কালে—ব্রজলীলা-স্মরণের সময়ে, পূর্ব-লীলা স্মরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেন, আনুশঙ্গিকভাবে সাধক-জীব-সমূহকেও ভজনের আদর্শ দেখাইতেন ।

গলে পরে গুঞ্জামালা—লীলা-স্মরণের সময়ে প্রভু গুঞ্জামালা গলায় ধারণ করিতেন—ব্রজলীলার উদ্দীপক বলিয়া ।

২৮৫-৬। “গোবর্দ্ধনের শিলা” ইত্যাদি দুই পয়ার ।

আর,—গোবর্দ্ধনের শিলাখণ্ডকে অত্যন্ত প্রীতির সহিত প্রভু কখনও হৃদয়ে ধারণ করিতেন, কখনও নেত্রে ধারণ করিতেন, কখনও বা মস্তকে ধারণ করিতেন ; আবার কখনও বা নাসাগ্রে ধারণ করিয়া শিলার আঁণ গ্রহণ করিতেন । এই সময়ে প্রভুর নেত্র হইতে অনবরত প্রেমাক্ষ পতিত হইত, আর সেই অক্ষতে শিলাখণ্ড সমাক্রূপে ভিজিয়া যাইত । এই শিলাখণ্ডকে প্রভু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই মনে করিতেন, তাই তাঁহার এত প্রীতি । রাধাভাবে ভাবিত প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-কলেবর-সদৃশ এই শিলাখণ্ডকে কোথায় রাখিয়া যে তৃপ্ত হইবেন, তাহা যেন স্থির করিতে পারিতেন না ; তাই একবার বুকে, একবার চক্ষুতে, একবার মস্তকে ধারণ করিতেন ; কিছুতেই যেন তাঁহার প্রাণের আকুল পিয়সা মিটিত না ।

কভু নাসায় আঁণ লয়—যুগমদ ও নীলোৎপল একত্রে মিশ্রিত করিলে যে অপূর্ব সুগন্ধের উদ্ভব হয়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ তদপেক্ষাও চমৎকার প্রদ ; এই শিলাখণ্ডে প্রভু সেই চমৎকার প্রদ সুগন্ধই অহুভব করিতেন ।
কৃষ্ণকলেবর—শ্রীকৃষ্ণের দেহ ; শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ ।

২৮৭। তুষ্ট হঞা—রঘুনাথের বৈরাগ্যদর্শনে তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া ।

২৮৮। আগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম ও শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুলতা । বাস্তবিক এই জাতীয়

এই শিলার কর তুমি সাদ্বিক-পূজন ।

অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ২৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ব্যাকুলতাই সেবার প্রাণ । এইরূপ ব্যাকুলতা না থাকিলে কোনও ভজনাঙ্গের অমুষ্ঠানেই আশামুরূপ ফল শীঘ্র পাওয়া যায় না—ইহাই প্রভু এখানে ভঙ্গিতে জানাইলেন । প্রভু অচ্যুতও বলিয়াছেন “যদ্বাগ্রহবিদ্যা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥ ২২৪।১৫ ॥”

২৮৯। এই শিলার—গোবর্দ্ধন শিলার । এই শিলাকে শিলামাত্র বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক মাত্র মনে না করিয়া সাক্ষাৎ “শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ” মনে করিয়াই পূজা করিতে বলিলেন । শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ ; বিগ্রহে ও শ্রীকৃষ্ণে পার্থক্য নাই । “অরূপবৎ” ইত্যাদি ব্রহ্মহুতই তাঁহার প্রমাণ ।

সাদ্বিক পূজন—যে পূজায় রজঃ ও তমোগুণ পূজকের হৃদয়ে স্থান পায় না, তাহাই সাদ্বিক পূজা ; সাদ্বিক পূজায় পূজকের চিত্তে দম্ভ-অহঙ্কারাদির ছায়া পর্য্যন্তও থাকেনা, থাকে কেবল হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উথিত দৈন্ত । প্রাকৃত রজস্তমোগুণ সমাক্রূপে দূরীভূত হইলে থাকিবে কেবল প্রাকৃত সত্ত্ব ; ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভজনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাকৃত সত্ত্বও দূরীভূত হইয়া যাইবে (২২৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) ; তখনই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইবে ; এই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবেই শ্রীকৃষ্ণরূপাদির অমুভব সম্ভব হয় । হলাদিনী-সংবিদ-মিশ্রিত সন্ধিনীর সার অংশের নামই শুদ্ধসত্ত্ব—ইহা অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু ।

প্রশ্ন হইতে পারে—সত্ত্ব হইল একটা প্রাকৃত গুণ ; সাদ্বিকীপূজা হইল গুণময়ী পূজা । গুণময়ী পূজাতে গুণাভীত শ্রীকৃষ্ণের সেবা কিরূপে হইতে পারে ? শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথদাসকে গুণময় সাদ্বিক পূজনের উপদেশ দিলেন কেন ?

উত্তর—ভজনের প্রারম্ভে সাধকের চিত্তে প্রায়শঃই মায়িক তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব গুণ থাকে । তমঃ হইতেছে অন্ধকারময় ; ইহার আবরণাঙ্গিকা শক্তি আছে ; কোন্ কার্য্য জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলজনক, কোন্ কার্য্য তাহা নহে—তাহা নির্ণয় করিবার বুদ্ধিকে ইহা আবৃত করিয়া রাখে ; সুতরাং তমোগুণাচ্ছাদিত সাধক তাহা নির্ণয় করিতে পারে না । রজোগুণের চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মাইবার শক্তি আছে । তাই রজোগুণ চিত্তের চঞ্চলতা জন্মায়, কোনও একটা বিষয়ে চিত্তের স্থিরতা জন্মাইতে পারে না । সত্ত্বগুণ কিন্তু উদাসীন ; ইহা তমোগুণের ছায় চিত্তকে আবৃতও করে না, রজোগুণের ছায় চিত্তকে বিবিধ বিষয়ে বিক্ষিপ্তও করে না ; তাই সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তি কোনও এক বিষয়ে চিত্তকে স্থির করিয়া রাখিতে পারেন । অধিকন্তু সত্ত্বের স্বচ্ছতাগুণ আছে এবং চিত্তের প্রসন্নতাজনক গুণও আছে । তাই সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তি প্রসন্নচিত্ত হইতে পারেন এবং নিজের পরমতম অভীষ্ট-বস্তুর অমুভবও লাভ করিতে পারেন ; অবশ্য এই অমুভব অনাবৃত নহে ; স্বচ্ছ কাচের অপর পার্শ্বে স্থিত বস্তুর ছায় দর্শকের পক্ষে আবৃত—কাচের অপর পার্শ্বের বস্তু কাচের দ্বারা আবৃত বা ব্যবহিত, সত্ত্বগুণের অপর পার্শ্বের বস্তু থাকে সত্ত্বগুণদ্বারা আবৃত বা ব্যবহিত । অচ্ছ বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া (ইহা করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণরূপার উপর নির্ভর করিয়া যত্নপূর্বক ; “যদ্বাগ্রহ বিদ্যা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে”, এইরূপে অপর সমস্ত বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া) জীবের পরমতম অভীষ্ট বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং তাহাতেই চিত্তের নিষ্ঠা স্থাপনের চেষ্টাপূর্বক প্রসন্ন চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পূজাই হইতেছে—সাদ্বিকী পূজা । এইরূপ চেষ্টা যাহার থাকে, স্বয়ং ভক্তিরাগীই তাঁহার চিত্তের সত্ত্বগুণকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া রজঃ ও তমঃকে নির্জিত করিবেন এবং পরে সত্ত্বকেও দূরীভূত করিবেন (২২৩৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । এইরূপে মায়ার তিনটা গুণ অপসারিত হইলে চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইবে ।

জীবশিক্ষার উদ্দেশ্যেই রঘুনাথদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু জীবের প্রতি সাদ্বিক পূজনের উপদেশ দিয়াছেন । রঘুনাথদাস নিত্যসিদ্ধ পার্শ্বদ (৩৬৪৬-পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য) ; তাঁহার চিত্তে মায়ার কোনও গুণই নাই ; তাঁহার চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ; সুতরাং তাঁহার পূজা শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা পূজা ।

এক কুজা জল আর তুলসীমঞ্জরী ।
 সাদৃশ্য সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥ ২১০
 দুইদিকে দুইপত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী ।
 এই মত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥ ২১১
 শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা ।
 আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥ ২১২

একবিতস্তি দুই বস্ত্র, পিঁড়ি একখানি ।
 স্বরূপগোমাঐ দিলেন কুজা আনিবারে পানী ॥ ২১৩
 এইমত রঘুনাথ করেন পূজন ।
 পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' । ২১৪
 'প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা' ।
 এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা ॥ ২১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

পরবর্তী পয়ারে সাদৃশ্য পূজার প্রকার বলা হইয়াছে ।

২১০ । এক কুজা জল, আর তুলসীমঞ্জরী, আর শুদ্ধভাব—এই হইল সাদৃশ্য-পূজার উপকরণ । বাহিরের উপকরণ হইল জল ও তুলসীমঞ্জরী ; আর ভিতরের উপকরণ হইল শুদ্ধভাব ; এই শুদ্ধভাবটাই বোধ হয় মুখ্য উপকরণ ; হৃদয়ে শুদ্ধভাব না থাকিলে কেবল এককুজা জল আর তুলসী মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেই সাদৃশ্যপূজা হইবে না ।

কুজা—মাটির তৈয়ারী এক রকম জলপাত্র ।

শুদ্ধভাব—শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাংপর্যায়ী ইচ্ছা ; যাহাতে নিজের ঐহিক বা পারলৌকিক কোনওরূপ সুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও থাকে না, এবং যাহাতে থাকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের বাসনা, তাহাকেই শুদ্ধভাব বলে ।

জল ও তুলসীমঞ্জরীর অতিরিক্ত কিছু দিলেই যে সাদৃশ্য পূজা নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা নহে । চিন্তে যদি শুদ্ধভাব থাকে, প্রেম থাকে, অহৈতুকী ভক্তি থাকে, তাহা হইলে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেও তাহা সাদৃশ্য-পূজা হইবে । রঘুনাথ কান্দাল, জল-তুলসী ব্যতীত অপর কোনও উপচার তিনি সংগ্রহ করিতে পারিবেন না ; তাই তাঁহাকে কেবল জল-তুলসীর কথাই প্রভু বলিলেন । যিনি জল-তুলসী ব্যতীত অপর উপকরণ অছাপেক্ষা না করিয়া অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি তাহা শ্রীকৃষ্ণকে না দিলে বোধ হয় তাঁহার পক্ষে বিত্ত-শাঠ্যই প্রকাশ পাইবে ।

২১১ । কিরূপ এবং কয়টি তুলসী-মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ করিতে হইবে, প্রভু তাহাও বলিতেছেন ।

দুই দিকে ইত্যাদি—মঞ্জরীটি কোমল হইবে, আর চয়ন করিবার সময় এমনভাবে চয়ন করিবে, যেন ঐ মঞ্জরীর দুই পার্শ্বে দুইটি পাতা থাকে । এইরূপ আটটি মঞ্জরী লইয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-চরণে নিবেদন করিবে ।

কোমল-মঞ্জরী বলাতে বোধ হয় ইহাই বুঝায় যে, যে মঞ্জরী অনেক দিন হইল বাহির হইয়া গিয়াছে, সুতরাং যাহা শক্ত হইয়াছে, কিম্বা যাহা ফুটিয়া গিয়াছে, এরূপ মঞ্জরী দেওয়া তত প্রশস্ত নহে ।

২১২ । শ্রীহস্তে—শ্রীমদ্মহাপ্রভুর নিজ হাতে । এই আজ্ঞা—সেবা সম্বন্ধে পূর্বোন্নিখিত উপদেশ ।

২১৩ । রঘুনাথ কান্দাল ; শ্রীগিরিধারী-বিগ্রহকে বসাইবার আসনই বা পাইবেন কোথায়, পরাইবার বস্ত্রই বা পাইবেন কোথায়, আর জল আনিবার কুজাই বা পাইবেন কোথায় ? তাই স্বরূপদামোদর তাঁহাকে ঠাকুরের আসনের নিমিত্ত একখানা পিঁড়ি দিলেন, ঠাকুরকে পরাইবার জন্ত একখানা এবং গায়ে দেওয়াইবার জন্ত একখানা, এই দুই খানা এক বিঘত পরিমাণ কাপড় দিলেন ; আর জল আনিবার জন্ত একটা কুজা দিলেন ।

এক বিতস্তি—এক বিঘত ; আধ হাত । পানী—জল ।

২১৪ । পূজাকালে ইত্যাদি—পূজার সময়ে রঘুনাথ শিলা-খণ্ডকে আর শিলারূপে দেখেন না ; তিনি দেখেন, ঐ শিলাস্থানে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনই তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত ।

২১৫ । প্রেমে ভাসি গেলা—প্রভুর করুণার কথা এবং শ্রীশিলাখণ্ডের অপূর্ব মাহাত্ম্যের কথা ভাবিয়া রঘুনাথ প্রেমে বিহ্বল হইয়া যাইতেন, তাঁহার নয়ন হইতে প্রেমানন্দ পতিত হইত, সেই অশ্রুতে সমস্ত বক্ষঃ ভাসিয়া যাইত ।

জলতুলসীর সেবায় তাঁর যত সুখোদয় ।

ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয় ॥ ২৯৬

এইমত কথোদিন করেন পূজন ।

তবে স্বরূপগোসাঞি তাঁরে কহিল বচন—॥২৯৭

অষ্টকোড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ ।

শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের দম ॥ ২৯৮

তবে অষ্টকোড়ির খাজা করে সমর্পণ ।

স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ তাহা করে সমাধান ॥২৯৯

রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল ।

গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল—॥৩০০

শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমর্পিল গোবর্দ্ধনে ।

গুঞ্জমালা দিয়া দিলা রাধিকাচরণে ॥ ৩০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টকা ।

২৯৬। তাঁর—ব্রজেন্দ্র-নন্দনের ।

বিগুহ্ণ ভাবের সহিত, প্রেমের সহিত যদি কোনও ভক্ত কেবলমাত্র জল-তুলসী-দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যত সুখী হয়েন, প্রেম-শৃংখল স্বস্বখ-বাসনা-মলিন চিত্ত লইয়া ষোড়শোপচার দ্বারা কেহ সেবা করিলেও তত সুখী হয়েন না। “নানোপচারকৃত-পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ প্রেমৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিক্রমং স্থাৎ। যাবৎ ক্ষুদন্তি জঠরে জরঠা পিপাসা তাবৎ সুখায় ভবতো নমু ভক্ষ্য-পেয়ে ॥ পদ্মাবলী। ১৩ ॥”

ষোড়শোপচার—আসন-স্বাগতে সার্থ্যে পাণ্ড আচমনীয়মকম্। মধুপর্ক্যচমনানবসনাতরণানি চ ॥ স্নগন্ধ-সুমানো ধূপদীপ-নৈবেদ্যবন্দনম্। প্রয়োজয়েদর্চনায়ামুপচারাংস্ত ষোড়শ ॥ —আসন, স্বাগত, অর্ঘ্য, পাণ্ড, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, স্নান, বসন, আতরণ, স্নগন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দনা—অর্চনায় এই ষোলটি উপচারের নাম ষোড়শোপচার। হ, ভ, বি, ১১।৪৬ ॥” মতান্তরে—“আসনাবাহনকৈব পাণ্ডাৰ্ঘ্যচমনীয়কম্। স্নানং বাসো ভূষণং গন্ধঃ পুষ্পঞ্চ ধূপকঃ ॥ প্রদীপশ্চৈব নৈবেদ্যং পুষ্পাজলিতঃ পরম্। প্রদক্ষিণং নমস্কারো বিসর্গশ্চৈব ষোড়শ ॥ আসন, আবাহন, পাণ্ড ও অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্পাজলি, প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও বিসর্জন—এই ষোড়শোপচার। হ, ভ, বি, ১১।৪৯ ॥” যদি কখনও কোনও উপকরণের অভাব হয়, তাহা হইলে অনায়াসলব্ধ উপকরণ এবং মানস-কল্পিত উপচারের দ্বারা পূজা করিবে। “উক্তানাঞ্চোপচারাণামভাবে ভগবান্ সদা। ভক্তেনার্চ্যো যথালব্ধৈস্তৈস্তত্ত্বভাবিতৈরপি ॥ হ, ভ, বি, ১১।৫৫ ॥”

২৯৮। অষ্ট কোড়ির খাজা-সন্দেশ—আটটা কড়ি দিয়া যে খাজা-সন্দেশ কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা।

খাজা-সন্দেশ—খাজা ও সন্দেশ ; অথবা একপ্রকার সন্দেশ।

২৯৯। স্বরূপ-আজ্ঞায় ইত্যাদি—স্বরূপদামোদরের আদেশে গোবিন্দই খাজা-সন্দেশ কিনিবার নিমিত্ত রঘুনাথকে প্রত্যহ আটটা কড়ি দিতেন।

৩০০। গোসাঞির—শ্রীমন্মহাপ্রভুর। অভিপ্রায়—ইচ্ছা। গোসাঞির অভিপ্রায় ইত্যাদি—কি উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহাকে শিলা-গুঞ্জমালা দিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিতে করিতে রঘুনাথ যাহা স্থির করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

৩০১। রঘুনাথ মনে করিলেন—“গোবর্দ্ধন-শিলা দিয়া প্রভু আমাকে শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের চরণেই অর্পণ করিলেন ; আর গুঞ্জমালা দিয়া প্রভু আমাকে শ্রীরাধিকার চরণেই অর্পণ করিলেন। এ অধমকে শিলা-মালা দেওয়ার প্রভুর ইহাই অভিপ্রায়।” রঘুনাথ মনে করিলেন, ভবিষ্যতে শ্রীগোবর্দ্ধন আশ্রয় করিয়া শ্রীরাধারাগীর কিস্করীকূপে যুগল-কিশোরের সেবা করিবার ইঙ্গিতই বোধ হয় প্রভু তাঁহাকে দিলেন। প্রভুর অপ্রকটের পরে তিনি করিয়াছিলেনও তাহাই।

এই পয়ারের টিকায় শ্রীপাদ বিদ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—“শ্রীবৃন্দাবনীয়োত্তম-যুগলবস্ত্র-দানেন যুগল-ভজনমেবোপদিষ্টমিতি—শ্রীবৃন্দাবনের উত্তম দুইটি বস্ত্র (যুগলবস্ত্র) দান করিয়া প্রভু যুগল-কিশোরের ভজনই উপদেশ করিলেন।”

আনন্দে রঘুনাথের বাহুবিস্মরণ।

সাড়ে সাত প্রহর যায় বাঁহার স্মরণে।

কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ ॥ ৩০২

আহার-নিদ্রা চারিদণ্ড, সেহো নহে কোনদিনে ॥ ৩০৪

অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা ?

বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।

রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষণ্ডের রেখা ॥ ৩০৩

আজন্ম না দিল জিহ্বায় রমের স্পর্শন ॥ ৩০৫

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টকা।

৩০২। আনন্দে—প্রভুর রূপা এবং শিলা-গুঞ্জমালার কথা ভাবিয়া রঘুনাথের আনন্দ।

কায়মনে সেবিলেন ইত্যাদি—যথাবস্থিত দেহে প্রভুর পরিচর্যা দ্বারা কারিকী সেবা করিলেন এবং রাধা-ভাবে ভাবিত হইয়া প্রভু যখন ব্রজের ভাবে বিভোর হইতেন, তখন রঘুনাথ নিজেরও ঐ সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্নিহিত ব্রজস্বরূপে তাঁহার মানসিকী সেবা করিতেন; আর মনেও সর্বদা প্রভুর সুখকামনা করিতেন; প্রভুর উপদেশাভুয়ায়ী কাজ করিয়াও প্রভুর মনে সুখ উৎপাদন করিতেন।

৩০৩। এই পয়ারে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী রঘুনাথের নিয়মানুবর্তিতার কথা বলিতেছেন। পাষণ্ডের উপর অঙ্কিত রেখা যেমন কোন সময়েই লোপ পায় না, রঘুনাথের নিয়মও তদ্রূপ কোন সময়েই ভঙ্গ হয় নাই; ভজ্ঞ-সম্বন্ধে তিনি যে নিয়ম করিয়াছিলেন, সর্বদাই তাহা পালন করিয়াছেন; এক দিনের জন্তও একটা নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই। তাঁহার ভজ্ঞ-নিয়মের একটা দিগ্‌দর্শন পরবর্তী পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে।

৩০৪। আট প্রহর দিবা-রাত্রির মধ্যে রঘুনাথ সাড়েসাত প্রহরই ভজন করিতেন; আহার এবং নিদ্রার জন্ত মাত্র চারিদণ্ড সময় রাখিতেন। ভজ্ঞনের আবেশে যে দিন তন্ময় হইয়া যাইতেন, সেই দিন আহার-নিদ্রাও হইত না—সেই দিন আহার-নিদ্রার অহুস্কানই থাকিত না।

স্মরণে—লীলা-স্মরণে; মানসিক সেবায়।

কোনও কোনও গ্রন্থে “স্মরণের” স্থলে “স্মরণকীৰ্ত্তনে” এবং “সাড়েসাত” স্থলে “সার্কসপ্ত” পাঠ আছে।

সেহো নহে কোনদিনে—যে দিন ভজ্ঞনের আবেশে তন্ময় হইয়া যাইতেন, সেই দিন আহার-নিদ্রাও হইত না।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারস্থলে নিম্নলিখিত পয়ার পাঠান্তর আছে—

“সাড়েসাত প্রহর শ্রবণ-কীৰ্ত্তন পূজায় যায়।

যে অর্দ্ধ প্রহর রহে, সেহো বাহুবৃন্তি নয় ॥”

রূপ-গুণ-লীলা-কথাতির শ্রবণে, শ্রীনাмаদির কীৰ্ত্তনে এবং শ্রীগিরিধারীর পূজায় সাড়েসাত প্রহর ব্যয় হইত; আর যে চারিদণ্ড সময় বাকী থাকিত, তখনও তাঁহার বাহুবৃন্তি থাকিত না; আহারের সময়েও ভজ্ঞনের আবেশ থাকিত, নিদ্রার সময়েও হয়ত লীলাতির স্বপ্নই দেখিতেন। রঘুনাথ প্রত্যহ একলক্ষ হরিনাম করিতেন, দশ সহস্র বৈষ্ণবের উদ্দেশে প্রণাম করিতেন, এবং যখন শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনবেলা শ্রীকুণ্ডে অবগাহন স্নান করিতেন। “লক্ষ হরিনাম, দশ সহস্র বৈষ্ণবের প্রণাম। ১।১০।১৭ ॥ তিন বেলা রাধাকুণ্ডে অপত্নিত স্নান ॥ ১।১০।১৯ ॥”

৩০৫। এক্ষণে রঘুনাথের তীর বৈরাগ্যের কথা গ্রন্থকার বলিতেছেন। রঘুনাথের যে বৈরাগ্য, তাহা শুদ্ধ বৈরাগ্য নহে, কেবল বৈরাগ্যের জন্ত বৈরাগ্য নহে; কৃষ্ণ-প্রীতির উন্মেষেই তাঁহার দৈহিক সুখ-ভোগের বাসনা দূরীভূত হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার এই বৈরাগ্য—এই বৈরাগ্যে তাঁহার দেহ বা মনে তিনি কোনওরূপ কষ্টও অনুভব করেন নাই, বৈরাগ্য-অভ্যাসের উৎকট চেষ্টায় তাঁহার চিত্তও কঠিন হইয়া যায় নাই। তিনি জোর করিয়া বৈরাগ্যকে আনেন নাই; কৃষ্ণ-প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যই স্বয়ং আসিয়া তাঁহার ভজ্ঞনের আনন্দকূল্য বিধান করতঃ তাঁহার সেবা করিয়াছে—তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বৈরাগ্যই স্বীয় সার্থকতা লাভ করিয়াছে। রঘুনাথের বৈরাগ্য একটা অদ্ভুত বস্তু—

ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিম্ব না পরে বসন ।

প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ ।

সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন ॥ ৩০৬

তাহা খাঞা আপনাকে কহে নির্বেদ-বচন ॥ ৩০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

জগতের ত্যাগীদিগের মধ্যে বৈরাগ্যে রঘুনাথের সমকক্ষ আর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ । তাঁহার বৈরাগ্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় পরবর্তী পয়ার-সমূহে দেওয়া হইয়াছে । এই সমস্ত বৈরাগ্যের বিবরণ পড়িবার পূর্বে পাঠক স্মরণ করিবেন, রঘুনাথের পূর্ব-অবস্থা কিরূপ ছিল, কিভাবে তিনি পূর্বে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন । যে সম্পত্তির কেবল রাজস্বের আয় বিশলক্ষ টাকা, যাহার সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য-কর-আদির আয় আরও অনেক বেশী ছিল, রঘুনাথ সেই বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন ; তাঁহার গৃহেও অপূরণ্য তুল্য স্ত্রন্দরী ও যুবতী ভাৰ্যা ছিলেন ।

রসের স্পর্শন—ভোজ্য বস্তু মাত্রেই মধুরাদি কোনও না কোনও রস আছে ; প্রাণ ধারণের নিমিত্ত রঘুনাথ যাহা কিছু আহাৰ করিয়াছেন, তাহাতেও মধুরাদি কোনও না কোনও রস অবশ্যই ছিল । তথাপি যে বলা হইল “জন্মাবধি তাঁহার জিহ্বা কোনও রস স্পর্শ করে নাই,” ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, জিহ্বার লালসায়, বা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছায় তিনি কোনও দিনই কোনও রস আশ্বাদন করেন নাই ; “এই জিনিসটী খাইতে বেশ ভাল লাগে”—এইরূপ মনে করিয়া তিনি কোনও দিন কিছু খায়েন নাই ; কিম্বা “এই জিনিসটী খাইতে ভাল লাগেনা”—এইরূপ মনে করিয়া কোনও খাওয়ার জিনিসও তিনি ত্যাগ করেন নাই । যখন যাহা পাইয়াছেন, প্রাণরক্ষার জন্ত (ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্ত নহে), তখনই তিনি তাহা নিজের প্রয়োজন মত আহাৰ করিয়াছেন ।

৩০৬ । ছিণ্ডা—ছেঁড়া, জীর্ণ । **কানি**—ছাকড়া, পুরাতন ছেঁড়া কাপড় । **বসন**—কাপড় । **ছিণ্ডা কানি** ইত্যাদি—নীলাচলে আসার পর হইতে রঘুনাথ কখনও নূতন বা ভাল কাপড় পরেন নাই ; লোক-সমাজে চলিতে হয় বলিয়া লজ্জা-নিবারণের প্রয়োজন ; তাই ছেঁড়া ছাকড়া যখন যাহা পাইতেন, তাহাই পরিতেন ; কেহ ভাল কাপড় দিলেও তাহা গ্রহণ করিতেন না । আর শীত-নিবারণের নিমিত্ত ছেঁড়া কাঁথা মাত্র ব্যবহার করিতেন ; কমলাদি ভাল শীতবস্ত্র কেহ দিলেও তাহা গ্রহণ করিতেন না । এই সকল ছেঁড়া ছাকড়া বা কাঁথাও বোধহয় তিনি কাহারও নিকটে চাহিয়া লইতেন না, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কেহ দিলে গ্রহণ করিতেন । অথবা পথে কুড়াইয়া পাইলে লইতেন ।

সাবধানে প্রভুর ইত্যাদি—“ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে” বলিয়া প্রভু যে আদেশ দিয়াছিলেন, রঘুনাথ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহা পালন করিয়াছিলেন ।

৩০৭ । প্রাণরক্ষা লাগি ইত্যাদি—রঘুনাথ যাহা কিছু খাইতেন, তাহাও কেবল নিজের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত, দেহের সুখের উদ্দেশ্যে নহে ; ভজনের নিমিত্ত প্রাণ-রক্ষার প্রয়োজন, তাই তাঁহার আহাৰ । কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তারপর ভজনোপযোগী দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম পাওয়া যায় ; এই-মনুষ্য-জন্মে যদি ভজন না করা যায়, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে যে আবার ভজনোপযোগী মনুষ্যজন্ম পাওয়া যাইবে, তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই—বৃক্ষ-লতাাদি স্থাবর-যোনি লাভও হইতে পারে ; তাহা হইলে তো আর ভজন হইবে না । একজন্মই ভজনের উদ্দেশ্যে সাধকেরা প্রাণরক্ষা করিতে চেষ্টা করেন ।

রঘুনাথ যাহা কিছু পাইতেন, তাহাই সম্বলিতভাবে আহাৰ করিয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করিতেন । আর নিজেকে নির্বেদ-বচন বলিলেন ।

নির্বেদ-বচন—‘অনাদিকাল হইতেই হতভাগ্য আমি নিজের স্বরূপ ভুলিয়া মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া দেহে আব্রুব্ধি পোষণ করিতেছি । দেহের সুখ-দুঃখকেই নিজের সুখ-দুঃখ মনে করিয়া আসিতেছি ; দেহের শাসনাকেই নিজের বাসনা বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি—দেহ-সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিয়াই কত কোটি কোটি

তথাহি (ভাঃ ৭।১৫।৪০)—

আত্মানং চেদ্বিজ্ঞানীয়াং পরং জ্ঞানধূতাশয়ঃ ।

কিমিচ্ছন্ কশ্চ বা হেতোর্দেহং পুষ্যাতি লম্পটঃ ॥ ৭

প্রসাদভাত পসারির যত না বিকায় ।

দুই তিন-দিন হৈলে ভাত সড়ি যায় ॥ ৩০৮

মোকের সংস্কৃত টীকা ।

নম্রাত্ততত্ত্বজ্ঞাত ভিক্ষো রিজিয়লৌল্যো কো দোষঃ তত্রাহ আত্মানং পরং ব্রহ্ম চেৎ বিজ্ঞানীয়াং জ্ঞানেন ধূতা নিরস্তা আশয়া বাসনা যশ্চ তশ্চ জ্ঞানিনো লৌল্যমেব ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । তথাচ ঋতিঃ, আত্মানঞ্চৈব বিজ্ঞানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ । কিমিচ্ছন্ কামায় শরীরমহুসধ্বরেদিতি । স্বামী । পরং দেহাৎ পৃথক্ভূতম্ । চক্রবর্তী । ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

জন্ম অতিবাহিত করিয়াছি । ইঞ্জিরের দাসত্বকেই নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি, কখনও একবার নিজের স্বরূপের দিকে তাকাইয়া দেখি নাই, কখনও একবার নিজের স্বরূপাহুবন্ধি কর্তব্যের কথা ভাবি নাই । এমন হতভাগ্য আমি, এমন মোহান্বিত আমি—এখনও আমার ইঞ্জিরের দাসত্ব ঘুচিল না, এখনও আমার দেহে-আত্মবুদ্ধি ঘুচিল না, এখনও দেহের রক্ষার জন্ত আমাকে আহারের অন্বেষণ করিতে হয়, এখনও দেহের শীতাতপ-নিবারণের জন্ত বস্ত্রাদির খোঁজ করিতে হয় ; যে দেহের সঙ্গে আমার স্বরূপের কোনও সম্বন্ধই নাই, এখনও আমি তাহার সেবাই করিতেছি—” ইত্যাদি বাক্যই নির্বেদ-বচন । এইরূপ নির্বেদ-বচনের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে পরবর্তী “আত্মানং” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৭। অমৃত্য । আত্মানং চেৎ (আপনাকে) পরং (দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া) বিজ্ঞানীয়াং (যিনি জানিয়াছেন), জ্ঞানধূতাশয়ঃ (জ্ঞানবলে যাহার বাসনা নষ্ট হইয়াছে), [সঃ] (তিনি) কিমর্থং (কি অভিপ্রায়ে) কশ্চ বা হেতোঃ (কি নিমিত্তই বা) লম্পটঃ (দেহাদিতে আসক্ত হইয়া) দেহং (দেহকে) পুষ্যাতি (পোষণ করেন) ?

অনুবাদ । যে জন আপনাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিয়াছে এবং জ্ঞান দ্বারা যাহার বাসনা বিনষ্ট হইয়াছে, সে জন কি অভিলাষে, কি নিমিত্ত দেহাদিতে আসক্ত হইয়া দেহকে পোষণ করিবেন ? অর্থাৎ দেহাদি-প্রতিপালনে তিনি আসক্ত হইবেন না । ৭

৩০৭-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ।

৩০৮ । পূর্বে বলা হইয়াছে, রঘুনাথ ছত্রে যাইয়া মাগিয়া খাইতেন । কিছুকাল পরে, তিনি তাহাও ছাড়িয়া দিলেন । বোধহয়, ইহাতেও পরাপেক্ষা আছে বলিয়াই—ছত্রে প্রসাদ পাইতে হইলে, ছত্রের মালীকদের বা কর্মচারীদের অপেক্ষা রাখিতে হয় বলিয়াই, তিনি ছত্রে যাওয়াও ত্যাগ করিলেন । ইহার পরে কি ভাবে আহার সংগ্রহ করিতেন, তাহা “প্রসাদ ভাত” ইত্যাদি চারি-পয়ারে বলা হইয়াছে ।

সকলেই জানেন, পুরীতে আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদান্ন বিক্রয় হয় ; দুই তিন দিনের বাসি হইয়া পঁচিয়া গেলে সেই অন্ন আর কেহ কিনে না ; তাই দোকানদারগণ তখন ঐ পঁচা প্রসাদান্ন, সিংহদ্বারের বাহিরে গরুর সামুনে ফেলিয়া রাখে ; গরুগুলি তাহার কিছু খায়, কিছু খায়না । যাহা খায়না, তাহা পড়িয়া থাকে ; এইরূপে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে সেই প্রসাদান্নগুলি পঁচিয়া গলিয়া এমন দুর্গন্ধময় হয় যে, গরুগুলিও তাহা খাইতে পারে না । এইরূপে যেগুলি গরুও খাইতে পারেনা, রঘুনাথ সেই গলিত প্রসাদান্নগুলি সংগ্রহ করিয়া ঘরে আনিতেন এবং জলদিয়া ভাল রকমে ধুইয়া উপরের গলিত অংশ ফেলিয়া দিয়া মধ্যের যে শক্ত অন্নংশ থাকে, তাহাই লবণ দিয়া মাখিয়া খাইতেন । এইরূপ পঁচা প্রসাদান্ন সংগ্রহ করিতে কাহারও অপেক্ষা রাখিতে হয় না, কাহারও কোনওরূপ ক্ষতিও হয় না ।

পসারির—দোকানদারের । সড়ি যায়—পচিয়া যায় ।

প্রশ্ন হইতে পারে—প্রাকৃত বস্তু জড়, অচেতন ; তাহাই পঁচিতে পারে ; যাহা চিদ্বস্তু, তাহা পঁচিতে

সিংহদ্বারে গাবী-আগে সেই ভাত ডারে ।
 সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গা গাই খাইতে না পারে ॥ ৩০৯
 সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি ।
 ভাত পাখালিয়া পেলে দিয়া বহু পানী ॥ ৩১০
 ভিতরের দৃঢ় যেই মাজিভাত পায় ।
 লোণ দিয়া মাখি সেই সব ভাত খায় ॥ ৩১১
 একদিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল ।
 হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল ॥ ৩১২
 স্বরূপ কহে—এঁছে অমৃত খাও নিতি নিতি ।
 আমাসভায় নাহি দেও, কি তোমার প্রকৃতি ? ৩১৩
 গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্তা শুনিলা ।

‘আরদিন প্রভু আসি তাহাঁ কহিতে লাগিলা ॥ ৩১৪
 কাহাঁ বস্তু খাও সন্তে, আমায় না দেও কেনে ?
 এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে ॥ ৩১৫
 আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাথে ত ধরিলা ।
 তোমার যোগ্য নহে, বলি বলে কাটি নিলা ॥ ৩১৬
 প্রভু কহে—নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই ।
 এঁছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই ॥ ৩১৭
 এইমত রঘুনাথে বারবার কৃপা করে ।
 রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে । ৩১৮
 আপন উদ্ধার এই রঘুনাথদাস ।
 গৌরান্বিতবকল্লবক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৩১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

পারে না। মহাপ্রসাদ হইল চিদ্বস্তু; তাহা পচিবেই বা কেন, দুর্গন্ধময়ই বা হইবে কেন? উত্তর—বস্তুতঃ মহাপ্রসাদ চিদ্বস্তু; তাহা বিকৃতও হয় না, পঁচেও না, দুর্গন্ধময়ও হয় না। জীবের প্রাকৃত চক্ষুতে চিন্ময় বৃন্দাবনকেও যেমন প্রাকৃত স্থানের মত দেখায়, চিন্ময় ভগবদ্বিগ্রহকেও যেমন প্রাকৃত প্রতিমার মত দেখায়, তদ্রূপ চিন্ময় মহাপ্রসাদকেও প্রাকৃত অন্নের স্থায় পঁচা বলিয়া, দুর্গন্ধময় বলিয়া মায়াবদ্ধ জীবের মনে হয়। নীলবর্ণের চশমা ধারণ করিলে শুভ্র শব্দকে বা দুষ্ককেও যেমন নীলবর্ণ দেখায়, তদ্রূপ। মায়াবদ্ধ জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়েই মায়ার আবরণ আছে; এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া দেহীর বা জীবস্বরূপের যে শক্তি বিকশিত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া আসে। তাই, সুখস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জগৎ জীবস্বরূপের যে বাসনা, তাহাও জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া প্রাকৃত সুখের বা প্রাকৃত রসের বাসনারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। চিন্ময় মহাপ্রসাদে প্রাকৃত অন্নাতির লক্ষণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দোষেই পরিলক্ষিত হয়। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী যে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন, প্রাকৃত লোকের দৃষ্টিতেই তাহা পঁচা এবং দুর্গন্ধময়; বস্তুতঃ তাহা পঁচাও নয়, দুর্গন্ধময়ও নয়। তাহার সাক্ষী শ্রীমন্মহাপ্রভু; তিনি বলিয়াছেন—এই মহাপ্রসাদ অপূর্ব স্বাদবিশিষ্ট (৩৬৩১৭); স্বরূপ-দামোদরও এই প্রসাদকে পরম-লোভনীয় অমৃতস্বরূপ বলিয়াছেন (৩৬৩১৩)। ইহাই মহাপ্রসাদের স্বরূপ। আশুন যেমন কখনও নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়া ঠাণ্ডা হইতে পারে না, চিন্ময় মহাপ্রসাদও নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়া পঁচিতে বা দুর্গন্ধময় হইতে পারে না।

৩০৯। সিংহদ্বারে—শ্রীজগন্নাথ-অঙ্গনের সিংহদ্বারে। গাবী-আগে—গরুগুলির সামনে। ডারে—ফেলিয়া দেয়। সড়া গন্ধে—পঁচা গন্ধে। তৈলঙ্গা গাই—এক জাতীয় গাই।

৩১০। পাখালিয়া—প্রক্ষালন করিয়া; ধুইয়া।

পানী—জল।

৩১১। দৃঢ়—শক্ত। মাজিভাত—ভাতের মধ্যস্থিত অংশ। লোণ—লবণ।

৩১২। স্বরূপ—স্বরূপ-দামোদর। করিতে দেখিল—প্রসাদার ধুইয়া খাইতে রঘুনাথকে স্বরূপ দেখিলেন।

৩১৯। গৌরান্বিতবকল্লবক্ষে—শ্রীগৌরান্বিত-বকল্লব-কল্লব-নামক রঘুনাথদাস-লিখিত একখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্থ

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরান্স্তবকল্পতরোঃ (১১)—
 মহাসম্পদাবাদপি পতিতমুদ্রতা কপয়া
 স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং দ্রুত মুদিতঃ ।
 উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
 দদৌ মে গোবান্ধো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৮
 এই ত কহিল রঘুনাথের মিলন ।
 যেই ইহা শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥ ৩২০

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২১

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথদাস-
 মিলনং নাম ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কুজনং কুংসিতজনং পতিতং মাং যো মহাসম্পদাবাং সকাশাং উদ্রুত্যা স্বীয়ে স্বরূপে দ্রুত সমর্প্য মুদিতঃ হৃষ্টঃ
 সন্ প্রিয়ং উরো গুঞ্জাহারং অপচি গোবর্দ্ধনশিলাং মে মহ্যং দদৌ স গৌরান্ধো হৃদয়ে মনসি উদয়ন্ প্রাহুর্ভবন্ মাং মদয়তি
 হর্ষয়তীত্যর্থঃ । চক্রবর্তী ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

হইতে একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে ; এই শ্লোকে রঘুনাথ নিজেই তাঁহার প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার কথা
 লিখিয়া গিয়াছেন ।

শ্লো। ৮ । অম্বয় । মঃ (যিনি) পতিতং (পতিত) কুজনং (ঘৃণিত কুংসিত-জন) মাম্ অপি (আমাকেও)
 মহাসম্পদাবাং (মহাসম্পত্তিরূপ দাবাগ্নি হইতে) অপি (ও) কপয়া (কৃপাবশতঃ) উদ্রুত্যা (উদ্ধার করিয়া) স্বীয়ে
 স্বরূপে (নিজের অন্তরঙ্গ স্বরূপগোস্বামীর হস্তে) দ্রুত (সমর্পণ করিয়া) মুদিতঃ (আনন্দিত হইয়াছিলেন), প্রিয়ম্ অপি
 (নিজের অত্যন্ত প্রিয় হইলেও) উরোগুঞ্জাহারং (বক্ষঃস্থলস্থিত গুঞ্জাহার) গোবর্দ্ধনশিলাং চ (এবং গোবর্দ্ধনশিলা)
 মে (আমাকে) দদৌ (দান করিয়াছিলেন) [সঃ] (সেই) গৌরান্ধঃ (শ্রীগৌরান্ধ) হৃদয়ে (হৃদয়ে) উদয়ন্ (উদিত
 হইয়া) মাং (আমাকে) মদয়তি (আনন্দিত করিতেছেন) ।

অনুবাদ । যিনি পতিত এবং ঘৃণিত আমাকেও (শ্রীরঘুনাথ দাসকেও) মহাসম্পত্তিরূপ দাবাগ্নি হইতে
 কৃপাবশতঃ উদ্ধার করিয়া অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় বক্ষঃস্থলস্থিত
 প্রিয়-গুঞ্জাহার এবং গোবর্দ্ধন-শিলাও আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরান্ধ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া
 আমাকে আনন্দিত করিতেছেন । ৮

মহাসম্পদাবাং—মহাসম্পৎ (বিপুল বিষয়-সম্পত্তিরূপ) দাব (দাবানল) হইতে । গাছে গাছে ঘর্ষণে
 বনের মধ্যে আপনা-আপনি যে আগুন জলিয়া উঠে, তাহাকে বলে দাবানল । বিপুল-সম্পত্তিকে দাবানল তুল্য বলা
 হইয়াছে ; তাহার হেতু এই যে, বিপুল-সম্পত্তির অধিকারীকে ঐ সম্পত্তির সংশ্রবে যে উদ্বেগ-অশান্তি ভোগ করিতে
 হয়, তাহার জালাও দাবানলের জালায় তীব্র, অসহ্য । অথবা, যে বনে দাবানল জলিয়া উঠে, সেই বনে যেমন
 কোনও প্রাণী থাকিতে পারে না বা প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ যে চিন্তে বিপুল-সম্পত্তিসম্বন্ধীয় উদ্বেগ-উৎকর্ষাদি
 বিद्यমান, সেই চিন্তেও শ্রীকৃষ্ণগুণতা থাকিতে বা প্রবেশ করিতে পারে না । আবার, দাবানল যেমন বনের বাহির
 হইতে আসে না, বনের মধ্যেই যেমন তাহার জন্ম, তদ্রূপ বিপুল-সম্পত্তি-সম্বন্ধীয় উদ্বেগ-উৎকর্ষাদিও বাহির হইতে
 প্রায়ই আসে না, সম্পত্তির সংশ্রব হইতেই তাহার উদ্ভব ।

কোনও কোনও গ্রন্থে “ব” স্থলে “র” অর্থাৎ “মহাসম্পদাবাং”-স্থলে “মহাসম্পদারাং” এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ।
 অর্থ—মহাসম্পৎ (বিপুল বিষয়-সম্পত্তি) এবং দারা (স্ত্রী) হইতে । রঘুনাথদাস বিপুল বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী
 ছিলেন ; তাঁহার পরমাত্মন্দরী কিশোরী ভার্য্যাও ছিলেন । শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া এই দুইটি বস্তুর প্রভাব
 হইতেই তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন । এই দুইটির কোনও একটিই জীবকে সংসারে আসক্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ ।
 কিন্তু গৃহে অবস্থান-কালেও রঘুনাথ ছিলেন এই দুইটি বস্তুতে অনাসক্ত । তাঁহার পিতাই বলিয়াছেন—“ইন্দ্রসম

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ঐশ্বর্য, জী অঙ্গরাসম । এসব বাঁধিতে নারিলেক যার মন ॥ দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে । জন্মদাতা পিতা নারে প্রারদ্ধ ঘুচাইতে ॥ চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হৈঞাছে ইহাৱে । চৈতন্যচন্দ্রের বাউল কে রাখিতে পারে ॥ ৩৬৩৮-৪০ ॥” অতুল ঐশ্বর্য এবং পরমাসুন্দরী পত্নীর সান্নিধ্যে থাকিয়াও রঘুনাথের চিন্ত এই দুইটির একটীতেও লিপ্ত হয় নাই—ইহা কেবল তাঁহার অতি প্রভুর কৃপারই ফল । পরে প্রভুর কৃপাই ঐ দুইটি বস্তুর সান্নিধ্য হইতেও তাঁহাকে সরাইয়া নীলাচলে প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে লইয়া গিয়াছে ।

দারা-শব্দ স্বভাবতঃই বহু বচনান্ত । এস্থলে সমাহার-ব্ধন্দে একবচন হইয়াছে । মহাসম্পদশচ দারাশচ তেষাং সমাহারঃ । এই উভয় হইতে একই সন্ধে প্রভু রঘুনাথকে উদ্ধার করিয়াছেন ।